Subject: Bangla

MD. ABU TUHIN

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

(DUET)

STD.ID-123027

CELL: 01715-08 26 30

Scanned with CamScanner

Bangla-

[50 Marks]

1. কারক ও বিভক্তি এবং সমার্থ ও সম্বোধন পদ ✓
2. সমাস ✓
3. সন্ধি ✓
4. পদ প্রকরণ ✓
5. বাগধারা
6. বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বানান (শুদ্ধ, অশুদ্ধ),
7. এক কথায় প্রকাশ
8. ণত্ব ও ষত্ব বিধান ✓
9. কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা
10. ভাব-সম্প্রসারণ / সারাংশ
11. দরখাস্ত
12. রচনা
13. ধ্বনিতত্ত্ব ✓
14. বাক্য পরিবর্তন

① → কারক, সমাস, সন্ধি, পদ প্রকরণ, ণ-ত্ব, ষ-ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্য পরিবর্তন

② → এক কথায় প্রকাশ, বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বানান (শুদ্ধ, অশুদ্ধ), বাগধারা

③ → ভাব-সম্প্রসারণ / সারাংশ, দরখাস্ত, রচনা।

④ → বাংলা সাহিত্য।

Scanned with CamScanner

সাধারন জ্ঞান

① বাংলাদেশ 1971.

② বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে.

Scanned with CamScanner

~~সন্ধি~~ (

সন্ধি (

→ সন্ধি = মিলন বা একত্রীকরণ

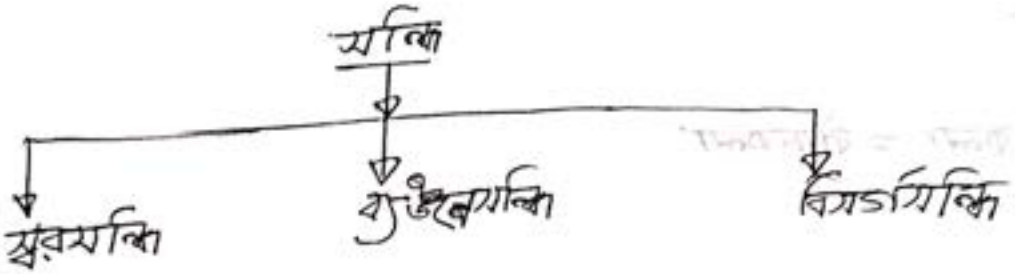

স্বরসন্ধি

❖ স্বরসন্ধি:

স্বরসন্ধি + স্বরসন্ধি = স্বরসন্ধি

কাঁথা + কারি = কাঁথারি ["আ" স্বরসন্ধি লোপ পেয়েছে].

আ + আ = আ

কতক = কত + এক
এ = অ + এ

যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই
আ + ই = এ

প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক
আ = অ + অ

মহাকায় = মহা + কায়
আ = আ + আ

কুড়িক = কুড়ি + এক

Scanned with CamScanner

<u>ব্যঞ্জনসন্ধি</u>

ছোটদা = ছোড়দা

↓ অঘোষ ↓ ঘোষ

কাঁচা + কলা = কাঁচকলা

Scanned with CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক : 'কারক' শব্দটির অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।
কারক ছয় প্রকার :

১. কর্তৃকারক
২. কর্ম কারক
৩. করণ কারক
৪. সম্প্রদান কারক
৫. অপাদান কারক
৬. অধিকরণ কারক

একটি বাক্যে ছয়টি কারকের উদাহরণ–
* বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।
এখানে

১.	বেগম সাহেবা	–	ক্রিয়ার	সঙ্গে	কর্তৃসম্বন্ধ
২.	চাল	–	"	"	কর্ম সম্বন্ধ
৩.	হাতে	–	"	"	করণ সম্বন্ধ
৪.	গরিবদের	–	"	"	সম্প্রদান সম্বন্ধ
৫.	ভাঁড়ার থেকে	–	"	"	অপাদান সম্বন্ধ
৬.	প্রতিদিন	–	"	"	অধিকরণ সম্বন্ধ

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + ০ বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ + ০ বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।

বাংলা শব্দ–বিভক্তি

০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ–বিভক্তি), এ, (য়), তে (এ), কে, রে,) র, (এরা) – এ কয়টিই খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তি। এ ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক–সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন–দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ–বিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

একবচন এবং বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

Scanned with CamScanner

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	: ০, অ, এ, (য়), তে, এতে।	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়া	: ০, অ, কে, রে (এরে), এ, য়, তে।	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	: ০, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, * গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, * দের দিয়ে।
চতুর্থী	: দ্বিতীয়ার মতো।	দ্বিতীয়ার মতো।
পঞ্চমী	: এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে।	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	: র, এর।	*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।
সপ্তমী	: এ, (য়), য়, তে, এতে।	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বন্ধনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

(ক) অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা' যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয়, যেমন–পাথরগুলো, গরুগুলি।

(খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'কে' বা 'রে' বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা – কলম দাও।

(গ) স্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির রূপ হয় – 'য়' বা 'য়ে'। 'এ' স্থানে 'তে' বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।

যেমন – মা+এ =মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।

(ঘ) অ–কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই 'রা' স্থানে 'এরা' হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্থলে 'এর' যুক্ত হয়। যেমন – লোক + রা = লোকেরা। বিদ্বান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদ্বানেরা। মানুষ +এর = মানুষের। লোক + এর =লোকের। কিন্তু অ–কারান্ত, আ–কারান্ত এবং এ–কারান্ত খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ 'র' যুক্ত হয়, 'এর' যুক্ত হয় না। যেমন – বড়র, মামার, ছেলের।

Scanned with CamScanner

কর্তৃকারক / কে / কারা

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক। যেমন – খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা – কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা – কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে :

১. **মুখ্য কর্তা** : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন – ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

২. **প্রযোজক কর্তা** : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

৩. **প্রযোজ্য কর্তা** : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। ওপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা।

তদ্রূপ – রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. **ব্যতিহার কর্তা** : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন –

বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। (এ) / সমজাতীয়

রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত। (এ) / ,,

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন–

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।

৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : হামিদ বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বশিরকে যেতে হবে।

গ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : আমার যাওয়া হয়নি।

২০১৮

Scanned with CamScanner

(ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।

পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।

বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

য়-বিভক্তি : ঘোড়ায় গাড়ি টানে।

তে-বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন–

বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।

খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন–

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ডাক্তার ডাক।

আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)

রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।

(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : তাকে বল।

রে বিভক্তি : 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা'।

Scanned with CamScanner

(গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : তোমার দেখা পেলাম না।

(ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।' (বীপায়)

করণ কারক

'করণ' শব্দটির অর্থ : যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়।

ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, তা-ই করণ কারক। যেমন –

নীরা কলম দিয়ে লেখে। (উপকরণ – কলম)

'জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।' (উপায় – সাধনা)

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা বল খেলে। (অকর্মক ক্রিয়া)

ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)

(খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : লাঙল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

দিয়া বিভক্তি : মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

(গ) সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।

শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

তে বিভক্তি : 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
তবু যেন তা মধুতে মাখা।' – নজরুল।

লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।

য় বিভক্তি : চেষ্টায় সব হয়।

এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়– ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।

(অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।)

Scanned with CamScanner

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) চতুর্থী বা কে বিভক্তি : ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। (স্বত্বত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন – ধোপাকে কাপড় দাও।)

(খ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : সৎপাত্রে কন্যা দান কর। সমিতিতে চাঁদা দাও। 'অন্ধজনে দেহ আলো'।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন–'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।'

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন–

বিচ্যুত : গাছ থেকে পাতা পড়ে।
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

গৃহীত : সুক্তি থেকে মুক্তো মেলে।
দুধ থেকে দই হয়।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
খেজুর রসে গুড় হয়।

বিরত : পাপে বিরত হও।

দূরীভূত : দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।

রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ঝোঁটা–আলগা ফল গাছে থাকে না।'
'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।'

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বাবাকে বড্ড ভয় পাই।

(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভক্ত : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়।

(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।

য় বিভক্তি : টাকায় টাকা হয়।

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

(ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।

(খ) দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।

(গ) নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ' 'য়' 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–

আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।

কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।

অধিকরণ তিন প্রকার : ১. কালাধিকরণ।
২. আধারাধিকরণ।
৩. ভাবাধিকরণ।

যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। যেমন –

সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ তিন ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক, ২. অভিব্যাপক এবং ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন –

পুকুরে মাছ আছে। (পুকুরের যে কোনো একস্থানে)

বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)

আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন–

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী,
ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে), রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।

২. অভিব্যাপক : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন–

তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)

নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে।)

Scanned with CamScanner

৩. বৈষয়িক : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

(ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই।

(খ) তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে।

(গ) পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।

(ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

পরিশিষ্ট

১। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

(ক) কর্তৃকারকে – রহিম বাড়ি যায়।

(খ) কর্মকারকে – ডাক্তার ডাক।

(গ) করণে – ঘোড়াকে চাবুক মার।

(ঘ) অপাদানে – গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।

(ঙ) অধিকরণে – সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বা এ বিভক্তি

(ক) কর্তৃকারকে – লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।

(খ) কর্মকারকে – এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।

(গ) করণে – এ কলমে ভালো লেখা হয়।

(ঘ) অপাদানে – 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?'

(ঙ) অধিকরণে – এ দেহে প্রাণ নেই।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন– মতিনের ভাই বাড়ি যাবে।

Scanned with CamScanner

এখানে 'মতিনের' সঙ্গে 'ভাই'–এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ) । পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)

কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন–

(ক) অধিকার সম্বন্ধ	:	রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
(খ) জন্ম–জনক সম্বন্ধ	:	গাছের ফল, পুকুরের মাছ।
(গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ	:	অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ	:	রূপার থালা, সোনার বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ	:	মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ	:	ধনের অহংকার, রূপের দেমাক।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	:	রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
(জ) ক্রম সম্বন্ধ	:	পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ	:	হাতির দাঁত, মাথার চুল।
(ঞ) ব্যবসায় সম্বন্ধ	:	পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	:	একের তিন, সাতের পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ	:	নজরুলের 'অগ্নিবীণা' মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
(ড) আধার–আধেয়	:	বাটির দুধ, শিশির ওষুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ	:	জ্ঞানের আলোক, দুঃখের দহন।

Scanned with CamScanner

(ণ) উপমান–উপমেয় সম্বন্ধ : ননীর পুতুল, লোহার শরীর।

(ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।

(থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : সবার সেরা, সবার ছোট।

(দ) কারক সম্বন্ধ :

(১) কর্তৃ সম্বন্ধ	–	রাজার হুকুম।
(২) কর্ম সম্বন্ধ	–	প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন।
(৩) করণ সম্বন্ধ	–	চোখের দেখা, হাতের লাঠি।
(৪) অপাদান সম্বন্ধ	–	বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি।
(৫) অধিকরণ সম্বন্ধ	–	ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

সম্বোধন পদ

'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন– ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন – 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?'

২. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।

৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন – ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস্।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তম উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) কোন্ বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন

খ. রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে

গ. বাঘে–মহিষে খানা একঘাটে খাবে না

ঘ. তোমাকে পড়তে হবে

Scanned with CamScanner

"কারক ও বিভক্তি এবং সমন্ধ ও সম্বোধন পদ"

বিভক্তি

কারক: কারক অর্থ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে বা যে করে বাক্যে ক্রিয়া পদের সাথে নামপদের সম্পর্কই কারক।"

[অন্বয় = সম্পর্ক]

বিভক্তি দুই প্রকার-

(ক) শব্দ বিভক্তি (খ) ক্রিয়া বিভক্তি

→ (১) প্রথমা (২) দ্বিতীয়া (৩) তৃতীয়া (৪) চতুর্থী (৫) পঞ্চমী (৬) ষষ্ঠী (৭) সপ্তমী

→ প্রথমা = ০০০০, অ, এ, তে

→ দ্বিতীয়া, চতুর্থী বিভক্তি = কে, রে

→ তৃতীয়া = দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক (by)

→ পঞ্চমী = হতে, থেকে, চেয়ে (from, than)

→ ষষ্ঠী = র, এর

→ সপ্তমী = এ, য়

(1) "কর্তৃ কারক" / "কে", কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে তবে উত্তরে যদি কর্তৃ কারক পাওয়া যায়।

⌀ কর্তৃ কারক:- কে বা কারা কাজ করে (বিশেষ্য ও সর্বনাম) (Noun) (Pronoun)

সকালে ঘোড়া আসে। (শূন্য বিভক্তি) প্রথমা বিভক্তি.

বাচ্চাটিকে কাজ করতে হয়. [কে] / দ্বিতীয়া / চতুর্থী.

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানো হয়েছে। [তৃতীয়া বিভক্তি]

সপ্তমী বিভক্তি

- ঘোড়ায় গাড়ি টানে. [য়]
- ছাগলে দুধ দেয়. [এ]
- বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে? [তে] → [এ]

মুখ্য কর্তা: ১জন বা অনেক কর্তা থাকলে, নিজেই/নিজেরাই কাজ করলে.

ছেলেরা কথা শুনে না.

আমি ঢাকা যাব.

সূর্য উঠে.
→ কর্তা কারক

ব্যতিহার কর্তা: দুই জন বা দুই পক্ষ এক বিষয়ে কাজ করলে.

বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি পান করে. [এ] / সপ্তমী / বিভক্তি

Scanned with CamScanner

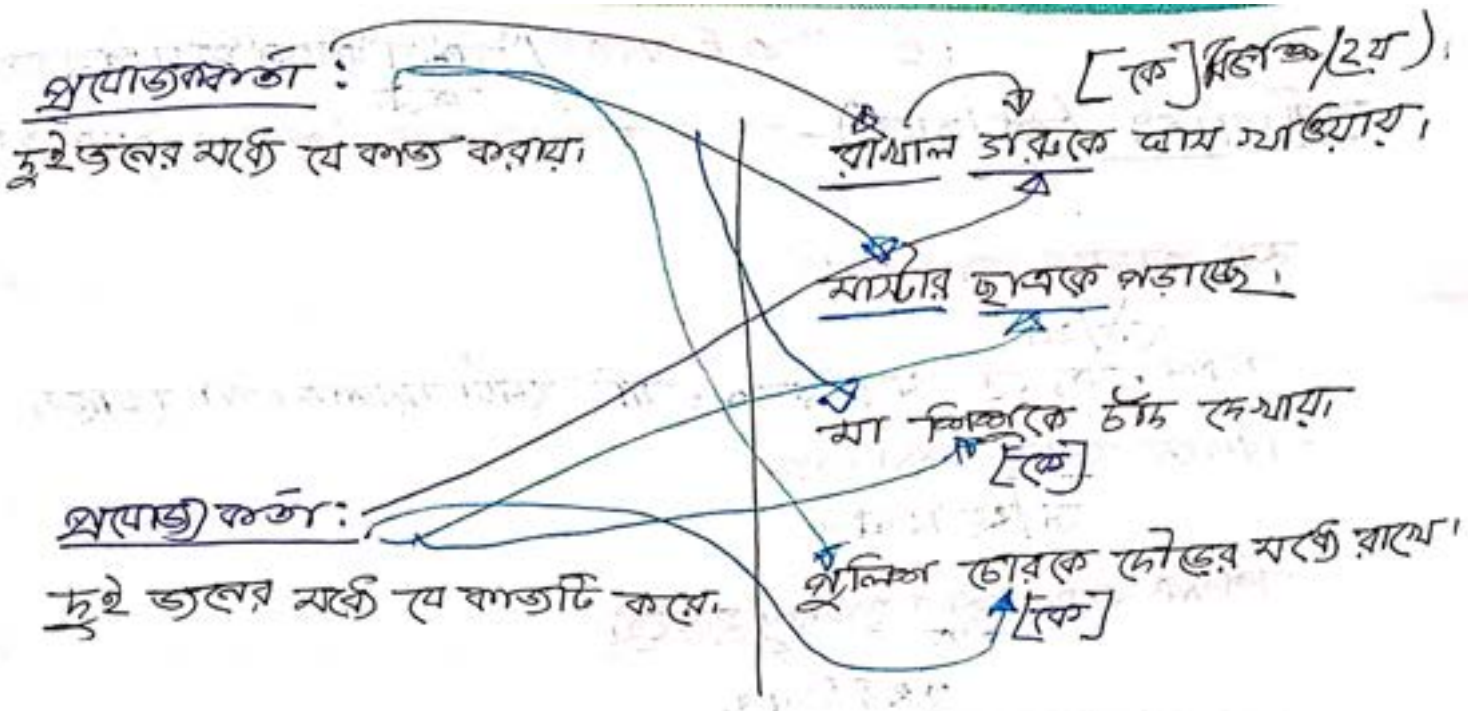

প্রযোজক কর্তা : দুই জনের মধ্যে যে কাজ করায়।

রাখাল [কে] (মিলেছি/২য়) ছেলেকে ঘাস খাওয়ায়।

মাস্টার ছাত্রকে পড়াচ্ছে।

মা শিশুকে [কে] চাঁদ দেখায়।

প্রযোজ্য কর্তা : দুই জনের মধ্যে যে কাজটি করে।

পুলিশ চোরকে [কে] দৌড়ের মধ্যে রাখে।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশ ভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন প্রকার-

ফেরদৌসি কর্তৃক (৩য়া) শাহনামা রচিত হয়েছে। [কর্ম বাচ্যের কর্তা Passive voice.]

ক্রিয়া সাধারণত → রচিত, সম্পাদিত, পঠিত, মুদ্রিত হয়ে থাকে।

কলমটা ভাল লেখে না।
বাঁশি বাজে।
} কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা

আমার খাওয়া হবে না।
আমাকে যেতে হবে।
তোমার কখন আসা হল।
তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
} ২য়া ৩য়া, ৬ষ্ঠী ভাব বাচ্যের কর্তা

Scanned with CamScanner

② "কর্ম কারক" / 'কি' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে।

কর্ম কারক: (কী / কাকে)। – যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

মা আমাকে ভাত দাও।
কে / ২য়

সকল কে, রে ২য় বিভক্তি, যদি সেটা সম্পাদন না বুঝালে।

বিপদে মোরে রক্ষা কর।
রে / ২য় বিভক্তি

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানো হয়েছে।
প্রথমা বিভক্তি

ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
→ ১মা বিভক্তি / কর্ম

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

তোমার দেখা পেলাম না

ভিক্ষাদিব ছেলে ভুলে।
এ / ৭মী বিভক্তি

মুখ্য কর্ম (বস্তু)

গৌণ কর্ম ব্যক্তি

মা আমাকে বই কিনে দিয়েছে।
(১মা বিভক্তি)

Scanned with CamScanner

কর্ম কারকের প্রকারভেদ,

→ সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম: নাসিমা মাছ কাটে।
কর্ম ক্রি

→ প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম: ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও
[কে/ইহা বিভক্তি]

→ সমধাতুজ কর্ম: আমি ছেলেটিকে খুব মার মেরেছি।
ক্রি

→ উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম: হলুদকে আমরা হরিদ্রা বলি।

উদ্দেশ্য
[যার সম্পর্কে বলা হয় সেটাই উদ্দেশ্য]

বিধেয়
[যা বলা হয় সেটাই বিধেয়]

Scanned with CamScanner

③ "করণ কারক" / "কীসের দ্বারা" বা "কী উপায়ে"

* করণ কারক: [যন্ত্র / সহায়ক / উপায়]

ছাত্ররা বল খেলে।
(বল → করণ)

ছাত্ররা ক্রিকেট খেলো।
(ক্রিকেট → কর্ম)

শিক্ষক ছাত্রকে বেত মেরেছে।
(বেত → করণ (সহায়ক))

মন্ত্রীতে মাথা।

N: 8→ কে, রে ব্যতিত যত একার (এ) থাকবে সব সপ্তমী বিভক্তি।

এ সুতোয় কাপড় হয়। (য়) / (৭মী)

আমরা কলম দিয়ে লিখে। (দিয়ে) (৩য়া)
(কলম → যন্ত্র)

* সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে
(সুতি কাপড় → কর্তৃ কারক)

শিকারি বেড়াল গোঁফে চেনা যায়। (এ) / ৭মী বিভক্তি
(গোঁফে → এ (সহায়ক))

Scanned with CamScanner

④ "সম্প্রদান কারক" / কর্মকারকের মত কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে।

সম্প্রদান কারক : দান, নিঃস্বার্থ,
কর্ম এর মত কাজ করে। [প্রাণি, বস্তু, কাজ]

[দান, মহৎ কাজ, নিঃস্বার্থ কাজ হলে সম্প্রদান হবে।]

[নিমিত্তার্থ বা কোন কিছুর জন্য বুঝালে সম্প্রদান হবে।]

ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। [কে / ৪র্থ বিভক্তি]
(ভিখারিকে → সম্প্রদান)
[যখন নিঃস্বার্থ হবে তখন ৪র্থ বিভক্তি]

সমিতিতে চাঁদা দাও। (তে) / ৭মী
→ নিঃস্বার্থ ভাবে

[ভিক্ষা = কর্ম
চাঁদা = কর্ম]

দোকানদারকে টাকা দাও। (কে) / ২য়া
(দোকানদারকে → কর্ম কারক)

[সমবায় সমিতিতে] চাঁদা দাও।
সম্প্রদান কারক হবে না কারণ এখানে স্বার্থ আছে।

অন্ধজনে দেহ আলো। (এ) / ৭মী
→ দান / সম্প্রদান

ক্লায়ার হাসপাতালে ভর্তি রোগীকে সেবা দাও। (কে) / ২য়া
(রোগীকে → কর্ম কারক)
→ এখানে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করা হয় নাই, টাকার বিনিময়ে কাজ করা হয়েছে।
"কে" আছে তাই এখানে ২য়া বিভক্তি হবে।
[৪র্থী " " না।
কারণ সম্প্রদান নয়।]

Scanned with CamScanner

জলের জন্য চল

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল। (মানসী, বধূ) → কবিতার লাইন

সম্প্রদান কারক → কাব্যগ্রন্থ

[নিমিত্তার্থে বুঝালে ২য়া বিভক্তি হয়] রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

⑤ অপাদান ও অধিকরণ

অপাদান (–) (দান) | "হতে" "থেকে" "চেয়ে" থাকলে | অধিকরণ (+) → (অধিকার) | "কোথায়" "কখন" দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে।

গাছ থেকে ফল পাই।
↳ অপাদান ↳ ৫মী বিভক্তি

গাছে ফল পেকেছে।
↳ (এ)/৭মী বিভক্তি

তিলে তৈল হয়।
↳ (এ)/৭মী

তিলে তৈল আছে।

সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু
(–→–) ↳ (৫মী)

আমার পরীক্ষা সোমবারে।
(+)(+)

বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ
↳ (এ) /৭মী

আমি বড় বিপদে আছি।
[অবস্থান বুঝালে অধিকরণ হবে]

তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন।
↳ (৫মী)

তিনি ঢাকায় থাকেন।

N:B: বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, ভূমিভূত, ও রক্ষিত।

আমি বাবাকে ভয় পাই।
↳ (২য়া)

আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (মেঘনাদবধ মহাকাব্য)
↳ রাঘব থেকে ভয় পাই।

বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না।
↳ অপাদান

ঢাকা থেকে খুলনা ৩৮০ কিমি.
↳ অপাদান → ৫মী

ঢাকায় ঢাকা হয়।
অপাদান ↳ কর্ম

নজরুল ছোট বেলায় স্কুল পালাতো
↳ অপাদান

শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে
↳ ৫মী

□ অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ

অধিকরণ তিন প্রকার—

① কালাধিকরণ → প্রভাতে সূর্য ওঠে।

② আধারাধিকরণ → পুকুরে মাছ আছে।

③ ভাবাধিকরণ → কান্নায় শোক ঘনীভূত হয়

বাড়ির থেকে দেখা যায়।
অধিকরণ

বাবা বাড়ি আছে।
(অধি)

বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন
(অপাদান)

দেহে প্রাণ নেই। → [যদিও এটা অপাদান কারক হতো]
(অধিকরণ) (N:B) বাক্যে Negative হলে কারকের কোন পরিবর্তন হবে না।

Scanned with CamScanner

"সম্বন্ধ পদ" "সম্বোধন পদ"

✍ সম্বন্ধ পদ:

রিয়ার ভাই ঢাকা যাবে।

✍ সম্বোধন পদ,

মা, ভাত দাও।

"সম্বোধন পদের পরে অবশ্যই কমা ব্যবহার করতে হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। তবে খাঁটি বাংলা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম **সমস্ত পদ**।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে **সমস্যমান পদ** বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় **পূর্বপদ** এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় **উত্তরপদ** বা **পরপদ**।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**। উদাহরণ–বিলাত–ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত–ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন – এ তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম – বিলাত হতে ফেরত, রাজার কুমার,সিংহে চিহ্নিত আসন – এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে 'বিলাত', ফেরত', 'রাজা, 'কুমার,' 'সিংহ', 'আসন' হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত–ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন – তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং , ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা–বাপ, মাসি–পিসি, জ্বিন–পরি, চা–বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা–কুমড়া, অহি–নকুল, স্বর্গ–নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়–ব্যয়, জমা–খরচ, ছোট–বড়, ছেলে–বুড়ো, লাভ–লোকসান ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত–পা, নাক–কান, বুক–পিঠ, মাথা–মুণ্ডু, নাক–মুখ ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত–পাঁচ, নয়–ছয়, সাত–সতের, উনিশ–বিশ ইত্যাদি।
৬. সমার্থক শব্দযোগে : হাট–বাজার, ঘর–দুয়ার, কল–কারখানা, মোল্লা–মৌলভি, খাতা–পত্র ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়–চোপড়, পোকা–মাকড়, দয়া–মায়া, ধূতি–চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনামযোগে : যা–তা, যে–সে, যথা–তথা, তুমি–আমি, এখানে–সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা–শোনা, যাওয়া–আসা, চলা–ফেরা, দেওয়া–থোওয়া ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে–সুস্থে, আগে–পাছে, আকারে–ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
১১. দুটি বিশেষণযোগে : ভালো–মন্দ, কম–বেশি, আসল–নকল, বাকি–বকেয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব : যে "দ্বন্দ্ব" সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে "অলুক দ্বন্দ্ব" বলে। যেমন – দুধে–ভাতে, জলে–স্থলে, দেশে–বিদেশে, হাতে–কলমে।

* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব–বিবি–গোলাম, হাত–পা–নাক–মুখ–চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস (Adjective, Noun)

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক–চতুর।
২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

Scanned with CamScanner

৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃতন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া পরে মোছা= ধোয়ামোছা।

৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।

৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন – মহৎ যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।

৬. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন – কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।

৭. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।

৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন –সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যথা– সিংহে চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ= স্মৃতিসৌধ।

২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।

৪. রূপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন– ক্রোধ রূপ অনল –ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু – বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি– মনমাঝি।

আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – অব্যয় : কুকর্ম, যথাযোগ্য। সর্বনাম : সেকাল, একাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : একজন, দোতলা। উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর ।

Scanned with CamScanner

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন – বিপদকে আপন্ন= বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। এরকম : গা–ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে–ভুলানো (ছড়া), নভেল–পড়া ইত্যাদি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : এক দ্বারা ঊন = একোন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম।

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত। এরূপ–হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা– গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা= আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ–ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্বযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, বালিকা–বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা – খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর' 'চেয়ে' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যথা– পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপভাবে –ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রের বধূ=পুত্রবধূ ইত্যাদি।

২. পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ =পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ।

৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা– ছাত্রের বৃন্দ =ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম=গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ ইত্যাদি।

৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ= অর্ধপথ, দিনের অর্ধ=অর্ধদিন।

৬. শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

৭. ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। এরূপ – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, ভোজনপটু, দানবীর, বাক্সবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন –পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

৭. **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** : না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা– ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ – অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্রূপ– আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আদুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না–বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা–

অভাব	–	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)।
ভিন্নতা	–	ন	লৌকিক	=	অলৌকিক ।
অল্পতা	–	ন	কেশা	=	অকেশা।
বিরোধ	–	ন	সুর	=	অসুর।
অপ্রশস্ত	–	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	–	ন	ঘাট	=	অঘাট।

এরূপ – অমানুষ, অসজ্জাত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন – জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ। এরূপ –গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা–চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা–পোষা ইত্যাদি।

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ–ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : গায়ে–হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা– বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

২০১৮

Scanned with CamScanner

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আত্মা যার = মহাত্মা, স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।

'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ –সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দ স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ। এরূপ – উর্ণনাভ।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দ স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জায়া যার = যুবজানি (যুবতী স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে জানি হয়েছে)।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্ত পদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্ত পদে 'কর্মা' হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যথা : সুগন্ধ যার = সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্‌ত, কমবখ্‌ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা : আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা–পোষা, পা–চাটা, পাতা–চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে –চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪. নঞ্ বহুব্রীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি বলে । নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম–নাহক, নিরুপায়, নির্ঝঞ্ঝাট, অবুঝ, অকেজো, বে-পরোয়া, বেহুঁশ, অনন্ত, বেতার ইত্যাদি।

৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি ভাবে – গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যাদি।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি । যথা– এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি–খরচে (খরচ+এ)। এরকম –দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৭. অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)। এরূপ – হাতে–ছড়ি, কানে–কলম, গায়ে–পড়া, হাতে–বেড়ি, মাথায়–ছাতা, মুখে–ভাত, কানে–খাটো ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যথা – দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা । এরূপ –চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিন্তু, সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের) = সেতার (বিশেষ্য)।

Scanned with CamScanner

৯. নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি

দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

৫. দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অব্দের সমাহার–শতাব্দী, পঞ্চবটের সমাহার–পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার–ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ–অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।

২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।

৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।

৪. পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।

৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।

৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ–যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।

৭. অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।

৮. বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।

৯. পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।

Scanned with CamScanner

১০. ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।

১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।

১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম) : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।

১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ –প্রপিতামহ।

১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।

১৫. প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

১. **প্রাদি সমাস** : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ –পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ =অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

২. **নিত্যসমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = কিরানব্বই।

অনুশীলনী

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।

৩. 'দ্বিগু সমাস প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা সমাস নয়, এটি কর্মধারয় সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত'–আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

৫. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে সবগুলো তৎপুরুষ সমাসের নাম কর।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দম্পতি, ধানক্ষেত, প্রগতি, বেতার, সহশিক্ষা।

৭. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

Scanned with CamScanner

"সমাস"

⌗ সমাস শব্দের অর্থ — সংক্ষেপ / মিলন / একাধিক পদের — একপদীকরণ।

সংজ্ঞা: "অর্থ সম্বন্ধ থাকা একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।"

সিংহ চিহ্নিত আসন
↓
সিংহাসন

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

ব্যাসবাক্য → বিগ্রহবাক্য / সমাসবাক্য

সমস্ত পদ → সমাস বদ্ধ পদ, সমাসনিষ্পন্ন পদ, সমাস সাধিত পদ, সমাস নিষ্পন্ন পদ

* "ব্যাসবাক্যের" অপর নাম "বিগ্রহ বাক্য"।

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
↓
২টি পদ [সিংহ + আসন]

সমস্যমান পদ → পূর্বপদ (সিংহ)
সমস্যমান পদ → পরপদ (আসন)

সমাস যুক্ত পদের অংশ — পূর্ব পদ
" " " পরবর্তী " — পরপদ

উদাহরণ

মা + বাবা = মা-বাবা (মা → পূর্বপদ, বাবা → পরপদ)

মা ও বাবা = মা-বাবা (ও → লুপ্ত হয়েছে)
নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম
রাজার কুমার = রাজকুমার

Scanned with CamScanner

সমাসের প্রকারভেদ-

(1) দ্বন্দ্ব সমাস

(2) কর্মধারয় সমাস

(3) তৎপুরুষ সমাস

(4) বহুব্রীহি সমাস

(5) দ্বিগু সমাস

(6) অব্যয়ীভাব সমাস

এছাড়া আছে,

অপ্রধান সমাস

(1) প্রাদি সমাস → প্র, প্রতি, অনু (অনুসর্গ যুক্ত হয়)

(2) নিত্য সমাস → ব্যাসবাক্য = সমস্তপদ

Ex- কেবল দর্শন = দর্শন মাত্র

(3) অলুক সমাস → বিভক্তি লোপ না পাই। সেটিই অলুক সমাস।

[1] দ্বন্দ্ব সমাস ("ও, এবং, আর" যুক্ত থাকে)

মা ও পিতা = মা-পিতা

দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম

দা এবং কুমড়া = দা-কুমড়া

* এবং, ও, আর - এই তিনটি অব্যয় যোগে যে সমাস হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

→ বহুপদী দ্বন্দ্ব = হাত-পা-চোখ-মুখ-নাক

↳ হাত ও পা ও চোখ ও মুখ এবং নাক।

Scanned with CamScanner

[২] কর্মধারয় সমাস

* বিশেষণ / বিশেষণ ভাবাপন্ন + বিশেষ্য / বিশেষ্য ভাবাপন্ন
(Adjective) (Noun)

বিশেষণ = দোষ, গুণ, অবস্থা
(Adjective)

বিশেষ্য = নাম [সে, তার]
(Noun) সর্বনাম (Pronoun)

নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।
নীল → বিশেষণ, পদ্ম → বিশেষ্য

যে চালক সেই চতুর = চালক চতুর
চালক → পূর্বপদ, চতুর → পরপদ
* এখানে পরপদ প্রধান।

❖ কর্মধারয় সমাস-এ পরপদ প্রধান।

কর্মধারয় সমাসের প্রকার ভেদ-

(I) মধ্যপদলোপী সমাস
(II) উপমান ,,
(III) উপমিত ,,
(IV) রূপক ,,

❖ [I] মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:

সাহিত্য সভা → সমস্তপদ (বিশেষ্য)
→ সাহিত্য বিষয়ক সভা।
(বিশেষণ ভাবাপন্ন) ← বিষয়ক → মধ্যপদ লোপ পেয়েছে
লোপ = নেই — অর্থ মধ্যপদ লোপ পেয়েছে

স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ

❖ বিশেষ কিছু:
* দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। EX- যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর
* ,, বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। EX- যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ-সাহেব।
* পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে তা পুরুষবাচক হয়। EX- সুন্দরী লতা = সুন্দরলতা
* পূর্বপদে 'কু' থাকলে এর স্থানে 'কদ্' হয়। EX. কু যে আচার = কদাচার
* পরপদে 'রাজা' থাকলে 'রাজ' হয়। EX. মহান যে রাজা = মহারাজ।

অন্যান্য, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

Scanned with CamScanner

[খ] উপমান কর্মধারয় সমাস

উপমান = তুলনীয় বস্তু

তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র

গুণ / অবস্থা
(সাধারণ ধর্ম উল্লেখ থাকে)

→ যেখানে "সাধারণ গুণ" উল্লেখ থাকে তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

[উপমান = তুলনীয় বস্তু]
একটা আর একটার সাথে তুলনা করা।

[গ] উপমিত কর্মধারয় সমাস

* মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

এখানে সাধারণ কোন গুণ উল্লেখ নেই।
এখানে বলা নেই মুখ চন্দ্রের মত গোল না উজ্জ্বল।

* পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ

→ যেখানে "সাধারণ গুণের" উল্লেখ "নেই" সেটাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।

[উপমিত = কোন গুণ উল্লেখ থাকে না]

[ঘ] রূপক কর্মধারয় সমাস

* এখানে অভিন্নতা উল্লেখ থাকবে।
(→ একই রকম)

ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল
(→ আগুন)

উপমান ও উপমেয়
অভিন্নতা

[5] দ্বিগু সমাস

(সমাহার/সমষ্টি)
↳ অনেক গুলো পদকে একত্র করা।

তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল
↳ সমস্ত পদ

সাত আকের সমাহার = সাতাকী
↳ সমস্ত পদ

বিগ্রহবাক্য
N: B: ব্যাসবাক্যকে ছোট করে আমরা সমস্ত পদ করি।
(বড় পদ) (ছোট পদ)

মাতা ও পিতা .... মাতা-পিতা

পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী
ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদ
তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা

একরূপ:
অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনা, তের নদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র।

মনে রাখার জন্য, এর মধ্যে "সমাহার" কথাটি উল্লেখ থাকবে।
এছাড়া, অনেক গুলো (সমষ্টি) পদ একত্রিত হবে।

Scanned with CamScanner

[3] তৎপুরুষ সমাস (পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়)

বিভক্তির প্রকার ভেদ-

(I) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি → অ, ০ (শূন্য)

(II) দ্বিতীয়া ,, → কে, রে

(III) তৃতীয়া ,, → দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক (By)

(IV) চতুর্থী ,, → কে, রে

(V) পঞ্চমী ,, → হতে, থেকে, চেয়ে (From, than)

(VI) ষষ্ঠী ,, → র, এর

(VII) সপ্তমী ,, → এ, য়, তে

ব্যাসবাক্য		সমস্ত পদ
বিপদকে আপন্ন	=	বিপদাপন্ন
মন দিয়ে গড়া	=	মনগড়া
পুত্রের বধূ	=	পুত্রবধূ

- পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
- "পরপদের" অর্থ "প্রধানরূপে" প্রতীয়মান হয়।

Scanned with CamScanner

তৎপুরুষ সমাস - এর প্রকার ভেদ

(I) দ্বিতীয়া -

(II) তৃতীয়া -

(III) চতুর্থী -

(IV) চতুর্থী -

(V) পঞ্চমী -

(VI) ষষ্ঠী -

(VII) সপ্তমী -

(VIII) নঞ -

(IX) উপপদ -

(I) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস (কে, রে)

(এখানে বিভক্তি লোপ পায়)

বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন

দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত

পূর্বপদের দ্বিতীয় বিভক্তি লোপ

ব্যাপ্তি অর্থে: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী

→ ব্যাপিয়া থাকলেও ২য়া বিভক্তি হবে → তৎপুরুষ সমাস,

একই ভাবে,
গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নভেলপড়া ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস (দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক)
→ (এখানে বিভক্তি লোপ পায়)

উদাহরণ:

মন দিয়ে গড়া = মনগড়া

শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ

✱ পূর্ব পদের তৃতীয় বিভক্তি লোপ পায়।

ব্যতিক্রম:

ঊন, হীন, শূন্য – তিনটি শব্দ উত্তরপদে থাকলেও তারা তৎপুরুষ সমাস হয়। (সমস্ত পদ বলে)

ব্যাস বাক্য	সমস্ত পদ	ব্যাস বাক্য
বিদ্যা দ্বারা হীন	বিদ্যাহীন	বিদ্যায় হীন
জ্ঞান দ্বারা শূন্য	জ্ঞানশূন্য	জ্ঞানে শূন্য

[য়, এ থাকবে সপ্তমী বিভক্তি নয়]

সমস্ত পদ → পূর্বপদ, পরপদ বা উত্তরপদ

(III) চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস (কে, রে)
↳ (এখানে বিভক্তি লোপ পায়)

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

বসন্তের জন্য বাড়ি = বসন্তবাড়ি

হজ্জের জন্য যাত্রা = হজ্জযাত্রা

→ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হওয়ার কারণ, এখানে বস্তু দান করা হয়েছে। কারণ গুরু থেকে সম্মান ফেরত নেওয়া হয় না।

পূর্ব পদের চতুর্থী (কে, জন্য, নিমিত্ত) বিভক্তি লোপ।

হজ্জের নিমিত্তে যাত্রা = হজ্জযাত্রা

ডাকের নিমিত্তে মাশুল = ডাকমাশুল

এরূপ আরো আছে,
ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, ভোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা,
হজ্জযাত্রা, য

(IV) পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস (হতে, থেকে, চেয়ে)

* পূর্ব পদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে) লোপ।

যাঁতা থেকে ছাড়া = যাঁতাছাড়া

বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত

ব্যতিক্রম:

অনুসর্গের প্রয়োগ : এর চেয়ে

পরাণের চেয়ে প্রিয় : পরাণপ্রিয়

(v) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস (র)

চায়ের জন্য বাগান = চাবাগান

রাজার পুত্র = রাজপুত্র

* পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায়।

ব্যতিক্রম:

ব্যাসবাক্যের "রাজার" স্থলে সমস্তপদে "রাজ" হয়।

রাজার পুত্র = রাজপুত্র

পিতা ও মাতার স্থলে যথাক্রমে (পিতৃ ও মাতৃ হয়)

মাতার সেবা = মাতৃসেবা

* ব্যাসবাক্যে "অর্ধ" শব্দটির পরপদে থাকলে তা পূর্বে বসে।

পথের অর্ধ = অর্ধপথ

Scanned with CamScanner

(VI) সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
(৭,ম)

গাছে পাকা = গাছপাকা

দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা

* পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি লোপ পায়।

* কোন কোন সময় ব্যাসবাক্যের পরপদ সমস্তপদের পূর্বে বসে।

পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব

পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব

(VII) নঞ তৎপুরুষ সমাস

(না)

ন আচার = অনাচার

ন কাতর = অকাতর

* না বাচক অব্যয় (না, নই, নাই, নয়) "পূর্ব পদে" যে তৎপুরুষ সমাস হয়।

বিশেষ অর্থ: (না বাচক ছাড়াই)

অভাব অর্থ: ন-বিশ্বাস = অবিশ্বাস

ভিন্নতা: ন লৌকিক = অলৌকিক

বিরোধ: ন-সুর = অসুর

↳ অসুর হলো যার সুরের সাথে বিরোধ রয়েছে যেটাই অসুর।

Scanned with CamScanner

(VIII) অলুক তৎপুরুষ সমাস

→ বিভক্তি লোপ পায় না।

* যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

গায়ে পড়া = গায়ে পড়া

বিয়ে পাগলা = বিয়ে পাগলা

গরুর গাড়ি = গরুর গাড়ি

Scanned with CamScanner

(IX) উপপদ তৎপুরুষ সমাস

❖ উপপদ কি?

যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে "কৃৎপ্রত্যয়" যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাই উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

ক্রিয়ামূল : চর + এ = চরে

জলে চরে যা = জলচর

(জলে → উপপদ)

পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ → অর্থ পদ্মফুল

(৫) বহুব্রীহি সমাস

→ সমস্তপদ

বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি

স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা

* যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যার, যাতে- এই শব্দগুলো ব্যাসবাক্যের শেষে থাকে।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকার ভেদ-

(I) সমানাধিকরণ (II) ব্যধিকরণ (III) ব্যতিহার (IV) নঞ

(V) মধ্যপদলোপী (VI) প্রত্যয়ান্ত (VII) অলুক (VIII) সংখ্যাবাচক

(III) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস

হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি

কানে কানে যে যুদ্ধ = কানাকানি

ব্যতিহার অর্থ পারস্পরিকতা

পদ-ক্রিয়ার পারস্পরিকতা অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়।

(VII) অলুক বহুব্রীহি সমাস

→ বিভক্তি লোপ পাবে না

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি

গলায় গামছা যার = গলায়গামছা

→ "যার" থাকলে অলুক বহুব্রীহি সমাস হবে।

(VIII) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস

↓

Scanned with CamScanner

৬) অব্যয়ীভাব সমাস

→ উপ, আ, পরি প্রভৃতি অব্যয় শব্দ

জানু (হাঁটু) পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত
→ পর্যন্ত / অব্যয়ীভাব সমাস

☐ পূর্ব পদের অব্যয় যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়

☐ অব্যয়ীভাব সমাস-এ পূর্ব পদের প্রাধান্য থাকে।

কূলের সমীপে = উপকূল (উপ = সামীপ্য অর্থে) — কাছে

ঈষৎ নত = আনত (আ = ঈষৎ অর্থে)

শহরের সদৃশ্য = উপশহর (উপ = সাদৃশ্য অর্থে)

ব্যাসবাক্য — সমস্তপদ

☐ অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় গুলি বন্ধনীর মাধ্যমে দেখানো হল-

সামীপ্য (উপ): কন্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল

বিপ্সা (অনু, প্রতি): দিন দিন = প্রতিদিন, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ

অভাব (নিঃ, নির): আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা

পর্যন্ত (আ):

Scanned with CamScanner

(viii) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস

চৌচাল বিশিষ্ট যার = চৌচালি → ই প্রত্যয় যোগ হয়েছে

দো নল যার = দোনলা → আ প্রত্যয় যোগ হয়েছে

* পূর্বপদ "সংখ্যাবাচক" বিশেষণ ও পরপদ "বিশেষ্য" হলে এবং সমস্ত পদটি বিশেষণ হলে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি হয়.

দ্বিগু সমাসে " সমাহার থাকে না.

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসে "যার" থাকে ও প্রত্যয় থাকে.

তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

১. ণত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য–ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য–ণ এবং দন্ত্য–ন–এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ–এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট–বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন– ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ – এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ–এর পরে স্বরধ্বনি, য য় ব হ ং এবং ক–বর্গীয় ও প–বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন – কৃপণ (ঋ–কারের পরে প, তার পরে ণ), হরিণ (র–এর পরে ই, তার পরে ণ), অর্পণ (র্ + প্ + অ+ণ্), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + ণ্)। এরূপ – রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। → (হ্ম = হ+ম)

৪. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ–ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন – ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক। ত–বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন – অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

Scanned with CamScanner

২. ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

২. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন- অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।

৩. 'ঋ' এবং ঋ কারের পর 'ষ' হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, নৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।

৪. তৎসম শব্দে 'র'-এর পর 'ষ' হয়। যেমন- বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।

৫. র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।

৬. ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।

৭. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন-ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

"নত্ব ও ষত্ব বিধান"

ণ-ত্ব বিধান (সংস্কৃত শব্দে ব্যবহার করা হয়)

ণ ব্যবহারের নিয়ম:

① ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে মূর্ধন্য "ণ" ব্যবহৃত হয়েযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে
যব সময়ে মূর্ধন্য-'ণ' হয়।
টবর্গীয় ধ্বনি,- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

EX- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড, বণ্টন, খণ্ড, ঠাণ্ডা, মণ্ড, কণ্টক,

② ঋ, র, ষ -এর পরে মূর্ধন্য "ণ" হয়।

ঋ-এর ব্যবহার- ২টি রূপ:

(I) ঋ-কারের পর (বর্ণের পর)

EX- ঋণ

(II) "ৃ" কার-এর পর-'ণ'

EX- তৃণ

র- এর ব্যবহার- ৩টি রূপ:

(I) র-এর পর

EX- রণ, মরণ, ব্যাকরণ, কারণ, কারণ, স্মরণ, উচ্চারণ

(II) "্র" (র ফলা) -এর পর-'ণ'

EX- প্রাণ, ঘ্রাণ, ত্রাণ, চিত্রণ, প্রণয়,

(III) "র্" (রেফ) -এর পর -ণ

EX-বর্ণ,

Scanned with CamScanner

ষ-এর ব্যবহার- ২টি রূপ-

(I) 'ষ'-এর পর- 'ণ'

EX- ভীষণ, তীষণ, বর্ষণ

(II) ক্ষ (ক+ষ) -এরপর- 'ণ'

EX- লক্ষণ, ক্ষণ, রক্ষণ, সংরক্ষণ,

(৩) ঋ, র, ষ, -এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে "ণ" হয়,

EX- হরিণ (হ+র+ই+ণ)

∗ র-এরপরে স্বরধ্বনি, (অ, আ, ই, ঈ, উ) থাকবে।

(৪) ঋ, র, ষ, এর পরে য, য়, র, হ, ং এবং "ক"- বর্গীয় ও "প"-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী "ন" হবে মূর্ধন্য "ণ"

EX- অর্পণ (অ+র+প+ণ)

দর্পণ (দ+র+প+ণ)

(৫) কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়,

EX- চাণক্য, মাণিক্য, ডান, নিপুন, বণিতা, পাণি (হাত/বাহু)

(৬) সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব হবে না।

EX- ত্রিনয়ন, অগ্রনায়ক, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম

N: B: সমাসবদ্ধ শব্দে "ণ"-এর ব্যবহার করি না।

ষ-ত্ব বিধান (সংস্কৃত শব্দে ব্যবহৃত হয়)

(১) "ঋ" ও "র" কার এর পরে "ষ" হয়

Ex- ঋষি, কৃষক

(২) ট ও ঠ এর সাথে যুক্ত হলে "স" না হয়ে মুর্দন্য-"ষ" হয়

Ex - কাষ্ঠ, কষ্ট,

কিছু শব্দ আছে; মাস্টার, পোশাক, পোস্ট এগুলো বিদেশী শব্দ।
স্টেশন, স্টোর।

(৩) ই-কারান্ত ও উ কারান্ত উপসর্গের পর ধাতুগুলো দন্ত্যে "ষ" হয়।

Ex- অভিষেক, অভিসেক। অনুষদ, পরিষদ, অনুষঙ্গ।

অভি - ই কারান্ত
অনু - উ - কারান্ত

সংস্কৃত শব্দে শুধুমাত্র ণ-ত্ব, ষ-ত্ব বিধান ব্যবহার করা হয়।

N.B: বিদেশী শব্দে ণ-ত্ব, ষ-ত্ব বিধান ব্যবহার করি না।

Ex- "সাৎ"- একটি উপসর্গ - এখানেও ষ হয় না

"অগ্নিসাৎ"
"ভূমিসাৎ"

Scanned with CamScanner

ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান

☆ বিদেশী শব্দে কখনো ণ-ত্ব, ষ-ত্ব বিধান হয় না।

EX- ~~শব্দ~~ মডার্ণ নয় মডার্ন হবে।
গভর্ণর ,, গভর্নর ,,
ফার্ণিচার ,, ফার্নিচার ,,
গ্রীণ ,, গ্রীন ,,

☆ নবীন (র নেই তাই পরপর ন হবে)।
বরণ (র থাকে বলে পরে "ণ" হয়)

বিদেশী শব্দে ন, ষ হবে না	র/ষ এর পরে "ণ" হবে	ক/প বর্গীয় বর্ণের এর পরে হ/য় থাকলে	ট-বর্গীয় যুক্ত বর্ণে সর্বদা ণ হবে
মডার্ন	নবীন	অবেষণা	ঠাণ্ডা,
গভর্নর	বরণ (ব+র+ণ)	বহণ	ডেঙ্ক
ফার্নিচার	বর্ণ	লক্ষণ (ল+ক+ষ+ণ)	
গ্রীন		অগ্রহায়ণ	
প্যান্ট		**রচনা**	
পয়েন্ট		ভ্রমণ	

হ+ন = হ্ন
হ+ণ = হ্ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound) । যেমন – অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound) যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter) ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন–ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন – ক্ + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে 'হসন্ত' বা 'হল' চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

Scanned with CamScanner

ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি
ত থ দ ধ ন	৫টি
প ফ ব ভ ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড় ঢ় য় ৎ	৪টি
ং ঃ ঁ	৩টি
	মোট ৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ – এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন – অ + ই = ঐ, অ + উ = ঔ

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত – যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **সংক্ষিপ্ত স্বর** বা **'কার'**। যেমন – 'আ'–এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। 'ম'–এর সঙ্গে 'আ'–এর সংক্ষিপ্ত রূপ ' া ' যুক্ত হয়ে হয় 'মা'। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ–কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন – আ–কার (া), ই–কার (ি), ঈ–কার (ী), উ–কার, (ু), ঊ–কার (ূ), ঋ–কার (ৃ), এ–কার (ে), ঐ–কার (ৈ), ও–কার (ো), ঔ–কার (ৌ)। অ–এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

আ–কার (া) এবং ঈ–কার (ী) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই–কার (ি), এ–কার (ে) এবং ঐ–কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ–কার (ু), ঊ–কার (ূ) এবং ঋ–কার (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও–কার (ো) এবং ঔ–কার (ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মৃ, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন–ম্য, ম্র ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন 'কার' বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **'ফলা'**। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন– ম–এ য–ফলা = ম্য, ম– এ র–ফলা = ম্র, ম–এ ল– ফলা = ম্ল, ম–এ ব–ফলা = ম্ব। র–ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। 'ম্র'; আবার 'র' যদি ম–এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন–

ম-এ রেফ 'র্ম' তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঞ্জনটির মাথায় রেফ (´) দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন – হ-এ উ-কার=হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ-কার = শু, স-এ উ-কার=সু, র-এ উ-কার = রু, র-এ ঊ-কার = রূ, হ-এ ঋ-কার=হৃ।

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে	এগুলো	কণ্ঠ্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে	'ক'	বর্গীয়	বর্ণ
চ ছ জ ঝ ঞ	"	"	"	তালব্য	"	"	"	'চ'	"	"
ট ঠ ড ঢ ণ	"	"	"	মূর্ধন্য	"	"	"	'ট'	"	"
ত থ দ ধ ন	"	"	'	দন্ত্য	"	"	"	'ত'	"	"
প ফ ব ভ ম	"	"	"	ওষ্ঠ্য	"	"	"	'প'	"	"

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত, ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়, ৪. দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ্য।
ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গ গুলো ব্যবহৃত হয় ঃ

১ – ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর)
২ – দাঁতের পাটি
৩ – দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল
৪ – অগ্রতালু, শক্ত তালু
৫ – পশ্চাতালু, নরম তালু, মূর্ধা
৬ – আলজিভ
৭ – জিহবাগ্র
৮ – সম্মুখ জিহবা
৯ – পশ্চাদজিহবা, জিহবামূল
১০ – নাসা-গহ্বর
১১ – স্বর-পল্লব, স্বরতন্ত্রী
১২ – ফুসফুস

Scanned with CamScanner

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খণ্ড-ত (ৎ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র।

ং ঃ ँ – এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

ঙ ঞ ণ ন ম-এ পাঁচটি বর্ণ এবং ং ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন- ইংরেজি full-পূর্ণ এবং fool বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে হ্রস্ব হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন-ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন-লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব – উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, ঈদুল ফিত্‌র, ভূমি-লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ-কার এবং দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন-দিন, তিন, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন-অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

Scanned with CamScanner

ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

আগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছে প্রত্যকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে **স্পর্শ ব্যঞ্জন** বা **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী **স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি**গুলোকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. অঘোষ এবং ২. ঘোষ।

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় **অঘোষ ধ্বনি**। যেমন- ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে **ঘোষ ধ্বনি**। যেমন-গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

এগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক. অল্পপ্রাণ এবং খ. মহাপ্রাণ।

ক. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় **অল্পপ্রাণ ধ্বনি**। যেমন-ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

খ. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় **মহাপ্রাণ ধ্বনি**। যেমন-খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : শ, ষ, স, হ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় **উষ্মধ্বনি** বা **শিশধ্বনি**। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **উষ্মবর্ণ**।

শ ষ স – এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য্ (Y) এবং ব্ (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় **অন্তঃস্থ ধ্বনি**।

ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌছে। এ ধ্বনির উচ্চারণে জিহবার অবস্থান ই-ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ-ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। ই ঈ এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় **সম্মুখ ধ্বনি**। ই এবং ঈ-র উচ্চারণের বেলায় জিহবা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো **উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি**। এ **মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি** এবং আ **নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি**।

উ এবং ঊ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা আরও একটু নিচে আসে। অ-ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। উ ঊ ও অ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** বলা হয়। উ ও ঊ-ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় **উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** ও **মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** এবং অ-**নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি**।

Scanned with CamScanner

বাংলা আ–ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ–কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে লিখিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন–অমর, অনেক।

২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন– কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক্ + অ + র্ + অ; ব্+ অ + ল্ + অ)।

শব্দের অ–ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন– অমল, অনেক, কত।

২. সংবৃত বা ও–ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা– অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ–এর উচ্চারণ অনেকটা ও–এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।

১. 'অ'–ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

(ক) শব্দের আদিতে

১. শব্দের আদিতে না–বোধক 'অ' যেমন – অটল, অনাচার।

২. 'অ' কিংবা 'আ'–যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ–ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন – অমানিশা, কথা।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন – কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।

২. ক্ষ–ধ্বনি, এ–ধ্বনি, ঐ–ধ্বনি এবং ঔ–ধ্বনির পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন – তৃণ, দেব, ধৈর্য, নোলক, মৌন ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই–ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়। যেমন – গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

২. অ–ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ–ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। ঠোঁট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃত হয়ে 'ও'–এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে 'বিকৃত', 'অপ্রকৃত' বা 'অস্বাভাবিক' উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও 'স্বাভাবিক', 'অবিকৃত' ও 'প্রকৃত' উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন– অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা 'কোরে')। কিন্তু সমাপিকা 'করে' শব্দের 'অ' বিবৃত।

২. পরবর্তী ই, উ – ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র–ফলাযুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন – প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন–প্রভাত, প্রত্যয়, প্রণাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর 'অ' সংবৃত হয়। যেমন – প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

২. ই, উ–এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন – পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

আ : বাংলায় আ–ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু–ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)–এর মতো। যেমন– আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বাংলায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন– কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ হ্রস্ব। এরূপ– যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।

ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই–ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ–ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ – দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন– বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।

উ ঊ : বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ–ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর–বিশিষ্ট শব্দের বন্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন– চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ।

ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ–এর উচ্চারণ রি অথবা রী–এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র–ফলা+ ই–কার এর মতো হয়। যেমন– ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় ঋ–ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।

এ : এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা-(খ্যালা), বিবৃত।

১. সংবৃত

ক) পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন– পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন– কে, সে, যে।

ঘ) 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন– দেহ, কেহ, কেষ্ট।

ঙ) 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন – দেখি, রেণু, বেলুন।

২. বিবৃত : 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর 'এ' (a)-এর মতো। যেমন– দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।

এ- ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে– যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম– যেথা, সেথা, হেথা।

খ) অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন–খেড়া, চেড়া, স্যাঁতসেঁতে, গেঁজেল।

গ) খাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন– খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঘ) এক, এগার, তের – এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, 'এক' যুক্ত শব্দেও : যেমন– একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।

ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে; যেমন– দেখ্ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল্ (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল্ (ফ্যাল্), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ও + ই = অই, ওই। অ এবং ই- এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন – ক্ + অ + ই = কই, কৈ; ব্ + ই + ধ = বৈধ ইত্যাদি। এরূপ – বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন– গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয়। যেমন– সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

Scanned with CamScanner

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ– এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো **জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।**

চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ ঝ ঞ–এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় **তালব্য স্পর্শধ্বনি।**

ট-বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি।** আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় **মূর্ধন্য ধ্বনি।**

ত-বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন– এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় **দন্ত্য ধ্বনি।**

প-বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ভ ম – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের **ওষ্ঠ্যধ্বনি** বলে।

জ্ঞাতব্য

(১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগযন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে **স্পর্শ ধ্বনি।**

(২) ঙ ঞ ণ ন ম – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় **নাসিক্য ধ্বনি** এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় **নাসিক্য বর্ণ।**

(৩) ঁ চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে **অনুনাসিক ধ্বনি** এবং প্রতীকটিকে **অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ** বলে। যেমন– আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।

(৪) বাংলায় ঙ এবং ং বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন–রঙ / রং, অহংকার / অহঙ্কার ইত্যাদি।

(৫) ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা 'ইয়'–এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন – ভূঞা (ভুঁইয়া)।

(৬) চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ–এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন – জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।

(৭) বাংলায় ণ এবং ন–বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট–বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ণ–এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন – ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(৮) ঙ ং ঞ – এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন– সঙ্ঘ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঞা, ক্ষণ ইত্যাদি।

(৯) ন–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন–ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন– খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন– ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন– গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো–

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

Scanned with CamScanner

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব–এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

য : য–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ 'জ'–এর মতো। যেমন – যখন, যাবেন, যুগ্ম, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে 'য়' উচ্চারিত হয়। যেমন – বি + যোগ = বিয়োগ।

র : র–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তদ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ – রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ল : ল–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন – লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ব : বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়–ব এবং অন্তঃস্থ–ব–এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ–এ দুই রকমের ব–এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ–ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তস্থ 'য' ও অন্তঃস্থ 'ব'– এ দুটো অর্ধস্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)–র মতো। যেমন – নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি **উষ্মধ্বনি**। যেমন– আশীষ, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে **শিশধ্বনিও** বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উষ্ম বর্ণ। শ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাৎ দন্তমূল। ষ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স–এর সঙ্গে থ র ত থ কিংবা ন যুক্ত হলে স–এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন – স্খলন, স্রষ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য–স হয়। যেমন – শ্রমিক (স্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রস্ন)।

অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্যধ্বনি(ট ও ঠ)–এর আগে এলে স–এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন– কষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

হ : হ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। এ উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন – হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ং (অনুস্বার) : ং এর উচ্চারণ ঙ–এর উচ্চারণের মতো। যেমন – রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং–এর বদলে ঙ এবং ঙ–এর বদলে ং–এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

Scanned with CamScanner

ঃ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অঘোষ 'হ'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঃ এর উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা– আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন – বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন – দুঃখ (দুখ্‌খ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্‌কাল)।

ড় ও ঢ় : ড় ও ঢ়-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তাড়নজাত ধ্বনি। ড়-এর উচ্চারণ ড এবং র-এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ়-এর উচ্চারণ ড় এবং হ-এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন – বড়, গাঢ়, রাঢ়, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন – তক্তা (ত্ + অ + ক্ + ত্ + আ = তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে ঃ স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে ঃ

আ-কার (া) – বাবা, মা, চাকা;
ই-কার (ি) – পাখি, বাড়ি, চিনি;
ঈ-কার (ী) – নীতি, শীত, স্ত্রী;
উ-কার (ু) – খুকু, বুবু, ফুফু;
ঊ-কার (ূ) – মূল্য, চূর্ণ, পূজা;
ঋ-কার (ৃ) কৃতী, গৃহ, ঘৃত;
এ-কার (ে) ছেলে, মেয়ে, খেয়ে;
ঐ-কার (ৈ) বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;
ও-কার (ো) দোলা, তোতা, খোকা;
ঔ-কার (ৌ) পৌষ, গৌতম, কৌতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন–

ণ/ন-ফলা (ণ/ন/)– চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। চিহ্ন-র ও এবং কৃষ্ণ-র ঃ

ব-ফলা (ব)– বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ম- ফলা (ম)- তন্ময়, পদ্ম, আত্মা।

য- ফলা (্য) - সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা।

র- ফলা (্র)- গ্রহ, ব্রত, স্রষ্টা।

(র্ রেফ) - বর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, খর্ব।

ল- ফলা (ল)- ক্লান্ত, অম্লান, উল্লাস।

থ. ২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা- এ্যাপোলো, এ্যাটম, অ্যার্টনি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।

থ. ৩. বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন - সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, বুক্কিণী, সন্ধ্যা, ইত্যাদি।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ।

দুই বর্ণের যুক্ত:

ক্ক =ক্+ক। যেমন- পাক্কা, ছক্কা, চক্কর।

ক্ত = ক্+ত। যেমন- রক্ত, শক্ত, ভক্ত।

ক্ষ= ক্+ষ। (উচ্চারণ ক্ +খ-এর মতো) যেমন- শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা।

ক্স= ক্+স। বাক্স।

ঙ্ক= ঙ+ক। যেমন- অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা।

ঙ্খ= ঙ+খ। যেমন- শৃঙ্খলা, শঙ্খ।

ঙ্গ= ঙ+গ। যেমন- অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত।

ঙ্ঘ= ঙ+ঘ। যেমন- সঙ্ঘ, লঙ্ঘন।

চ্চ= চ্ +চ। যেমন- উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত।

চ্ছ= চ্+ছ। যেমন- উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ।

জ্জ= জ্+জ। যেমন- উজ্জীবন, উজ্জীবিত।

জ্ঝ= জ্+ঝ। যেমন- কুজ্ঝটিকা।

জ্ঞ= জ্ +ঞ। যেমন- উচ্চারণ 'গ্যাঁ'- এর মতো) যেমন- জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান।

ঞ্চ (ঞ্চ)= ঞ্ +চ। যেমন- অঞ্চল, সঞ্চয়, পঞ্চম।

ঞ্ছ= ঞ্ +ছ। যেমন-বাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছা।

ঞ্জ= ঞ্ +জ। যেমন- গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ।

ঞ্ঝ = ঞ্+ঝ। যেমন- ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট।

[বি. দ্র. উপর্যুক্ত চারটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ 'ন' হলে ও লেখার সময় কখনো নৃচ (অনৃচল), নৃ ছ (বানৃছ্য), নৃজ (গনৃজ), নঝ (ঝনৃঝা) রূপে লেখা ঠিক নয়।]

Scanned with CamScanner

ট্ট= ট্ +ট। যেমন– অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ড্ড= ড্ +ড। যেমন– গড্ডালিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন।

ণ্ট= ণ্+ট। যেমন– ঘণ্টা, বণ্টন।

ত্ত= ত্ +ত। যেমন– উত্তম, বিত্ত, চিত্ত।

থ্= ত্+থ। যেমন–উত্থান, উত্থিত, অভ্যুত্থান।

দ্দ= দ্ +দ। যেমন–উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।

ন্ধ= দ্ +ধ। যেমন– উদ্ধত, উদ্ধৃত, পদ্ধতি।

দ্ভ= দ্ +ভ। যেমন– উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ।

ন্ত= ন্+ত। যেমন– অন্ত, দন্ত, কান্ত।

ন্দ= ন্+দ। যেমন– আনন্দ, সন্দেশ, বন্দী।

ন্ধ= ন্+ধ। যেমন– বন্ধন, রন্ধন, সন্ধান।

ন্ন= ন্ +ন। যেমন– অন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন।

ন্ম= ন্ +ম। যেমন– জন্ম, আজন্ম।

প্ত= প্ +ত। যেমন– রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত।

প্প= প্ +প। যেমন– পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।

প্স= প্ +স। যেমন– লিপ্সা, অভীপ্সা।

ব্দ= ব্ +দ। যেমন–অব্দ, জব্দ, শব্দ।

ল্ক= ল্ +ক। যেমন– উল্কা, বল্কল।

ল্গ= ল্ +গ। যেমন– ফাল্গুন।

ল্ট= ল্ +ট। যেমন– উল্টা।

ষ্ক= ষ্ +ক। যেমন– শুষ্ক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।

স্ক= স্ +ক। যেমন– স্কুল, স্কন্ধ।

স্খ= স্ +খ। যেমন– স্খলন।

স্ট= স+ট। যেমন– আগস্ট, স্টেশন।

স্ত= স্ +ত। যেমন– অস্ত, সস্তা, স্তব্ধ।

স্প= স্ +প। যেমন–স্পষ্ট, স্পন্দন, স্পর্ধা।

স্ফ= স্ +ফ। যেমন– স্ফটিক, প্রস্ফুটিত।

হ্ম= হ্ +ম। যেমন– ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সূক্ষ্ম শব্দে ক্ষ্ম বর্ণ= ক্ +ষ+ম– ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের ন্ত্র্য=ন+ত+র–ফলা (্র) +য–ফলা (্য) ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

ধ্বনি তত্ত্ব

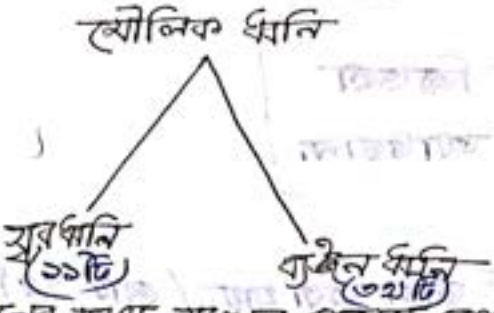

মৌলিক ধ্বনি
- স্বরধ্বনি (১১টি)
- ব্যঞ্জন ধ্বনি (৩৯টি)

স্বরধ্বনি: উচ্চারণের সময় মুখের বাতাস কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না।
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

ব্যঞ্জনধ্বনি: উচ্চারণের সময় মুখের বাতাস কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

* ক খ (অঘোষ) গ ঘ (ঘোষ) ঙ চ ছ (অঘোষ) জ ঝ (ঘোষ) ঞ ট ঠ (অঘোষ) ড ঢ (ঘোষ) ণ ত থ (অঘোষ) দ ধ (ঘোষ) ন
প ফ (অঘোষ) ব ভ (ঘোষ) ম য র ল শ ষ (অঘোষ) স হ (ঘোষ) ড় ঢ় (ঘোষ) য় ৎ ং ঃ ঁ

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। (প্রতীক)

স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনির লিখিত রূপ / সাংকেতিক " " " স্বরবর্ণ।

ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক্ + অ = ক

ট্ + অ = ট

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হল- "কার", যেমন- আ-কার, ই-কার (ি)

ব্যঞ্জনবর্ণের " " " - "ফলা", যেমন- য-ফলা, র-ফলা।

* ব্যঞ্জনবর্ণের ১ম ও ২য় বর্ণকে অঘোষ ধ্বনি বলে।
* " " ৩য় ও ৪র্থ " ঘোষ " "।
* " " ১ম ও ৩য় " অল্পপ্রাণ " "।
* " " ২য় ও ৪র্থ " মহাপ্রাণ " "।

স্পর্শ ধ্বনি: (ছোঁয়া)- ক থেকে ম পর্যন্ত ধ্বনি সমূহকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। (২৫টি)

[জিহ্বা এটাকে বলা হয় জিওভা
আহ্বান " " " আওভান]

☐ স্পর্শ ধ্বনিকে ৫টি বর্গে ভাগ করা যায়। (মোট ২৫টি বর্ণ)

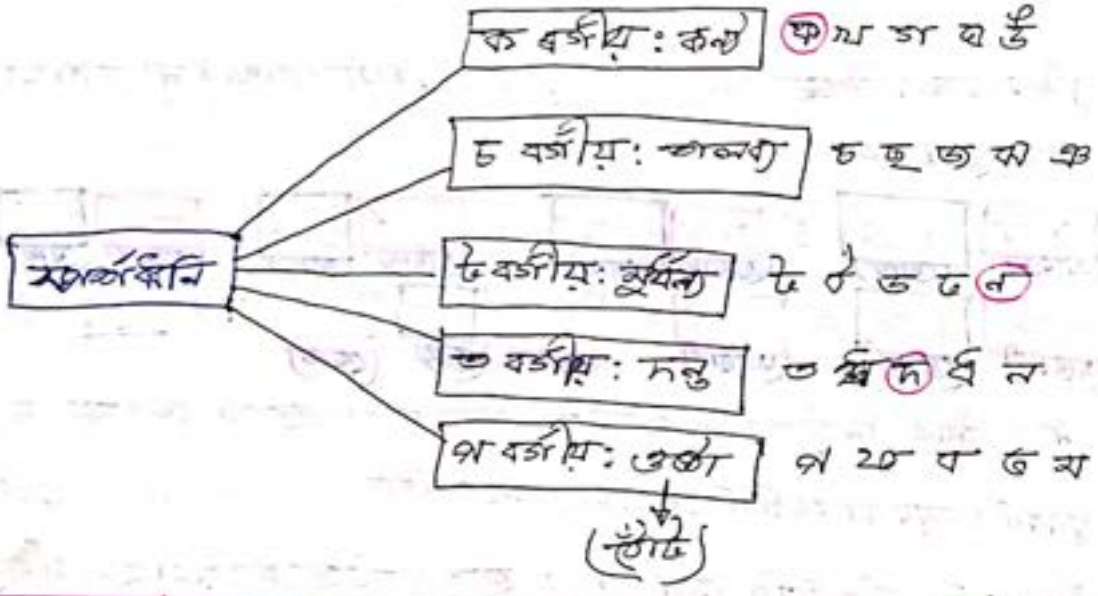

স্পর্শ ধ্বনি
- ক বর্গীয়: কন্ঠ — ক খ গ ঘ ঙ
- চ বর্গীয়: তালব্য — চ ছ জ ঝ ঞ
- ট বর্গীয়: মূর্ধন্য — ট ঠ ড ঢ ণ
- ত বর্গীয়: দন্ত — ত থ দ ধ ন
- প বর্গীয়: ওষ্ঠ (ঠোঁট) — প ফ ব ভ ম

উচ্চারণ স্থান	বর্ণ সমূহ	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল (জিভমূল)	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয়
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ [শ য য়]	তালব্য
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ [ষ র ড় ঢ়]	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়
অগ্রদন্তমূল	ত থ দ ধ ন [ল স]	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ (ঠোঁট)	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

Scanned with CamScanner

যৌগিক স্বর: পাশাপাশি থাকা দুটি স্বরধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। একে যৌগিক স্বর, যুক্তস্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। এছাড়া একে সন্ধিস্বর ও বলে।

অ + উ = অউ (বউ) বৌ, বৌ

অ + ই = অই (বই)

এছাড়া,

অ + উ = ঔ ; অ + ই = ঐ

২৫টি যৌগিক স্বর আছে।

* যৌগিক স্বর জ্ঞাপক বর্ণ হলো ২টি। মোট যৌগিক স্বর ২৫টি।

ক্ষ স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছের প্রত্যেকটি তে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলোকে বলে স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন।

[ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি স্পর্শ ব্যঞ্জন। সমূহ]

স্বরতন্ত্রী অনুরণিত (কেঁপে ওঠা) হয় না।

ক্ষ অঘোষ বর্ণ: ক খ চ ছ ইত্যাদি।

১ম দুইটি বর্ণ অঘোষবর্ণ।

ক্ষ ঘোষ বর্ণ: স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়। গ ঘ জ ঝ ইত্যাদি।

২য় দুইটি বর্ণ ঘোষ বর্ণ।

ক্ষ অল্পপ্রাণ বর্ণ: উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে।

ক গ চ জ

প্রতিটি বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি অল্পপ্রাণধ্বনি।

ক্ষ মহাপ্রাণ বর্ণ: উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে।

খ, ঘ, ঝ, ছ

প্রতিটি বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ বর্ণ।

Scanned with CamScanner

স্বরবর্ণ
↑
অ + ই = অই = ঐ
↓ ↓
স্বরবর্ণ যৌগিক স্বর বর্ণ

স্বরবর্ণ → মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর নিয়ে গঠিত হয়
স্বরধ্বনিতে বাতাস বাঁধা পাই না।

⌀ উষ্ম বর্ণ: [শ ষ স হ] এই চারটি বর্ণে কোন্তিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাস ধরে রাখা যায়। এর উষ্ম বর্ণ

⌀ অন্তঃস্থ ধ্বনি: য ও ব (অন্তঃস্থ ধ্বনি ২টি)

⌀ নাসিক্য ধ্বনি: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম - এই পাঁচটি বর্ণে নাক দিয়ে ফুসফুস তাড়িত বাতাস আসে। এরা নাসিক্য ধ্বনি।

⌀ অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ: চন্দ্রবিন্দুকে (ঁ) বলে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ

N.B: ঙ, ঞ, ং, ণ - এই চারটি বর্ণ কখনো শব্দের প্রথমে আসে না এগুলো সাধারণত মধ্যে বা শেষে বসে।

⌀ মৌলিক স্বর-(৭টি) - অ, আ, ই, ঈ, উ, এ, ও, এ্যা (অ্যা) ← ধ্বনিবিদ আব্দুল হাই তৈরি করেছে।

⌀ যৌগিক স্বর-(২৫টি) -

⌀ ~~স্বর~~

⌀ অর্ধ স্বরধ্বনি (৪টি) - ই, উ, য়, ও

⌀ যৌগিক স্বরজ্ঞাপকবর্ণ: (২টি) - ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)

Scanned with CamScanner

বর্ণ

ধ্বনির মাত্রা হিসাবে

- পূর্ণমাত্রা ৩২টি : স্বরধ্বনি ৬টি ব্যঞ্জনধ্বনি ২৬টি
- অর্ধমাত্রা ৮টি : স্বরধ্বনি ১টি ব্যঞ্জনধ্বনি ৭টি
- মাত্রাবিহীন ১০টি : স্বরধ্বনি ৪টি ব্যঞ্জনধ্বনি ৬টি

—— × —— × ——

- মাত্রাহীন বর্ণ - ১০টি — এ, ঐ, ও, ঔ (স্বরবর্ণ ৪টি) — ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ (ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)
- অর্ধমাত্রা - ৮টি — ঋ (স্বরবর্ণ ১টি) — খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ (ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি)
- পূর্ণমাত্রা - ৩২টি — অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ (স্বরবর্ণ ৬টি) — ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য় (ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।)

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন– আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (া) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে =তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। যেমন– 'আশা' ও 'অতীত' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'আশাতীত' তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ 'হিম আলয়' বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'হিমালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শ্রুতিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি–মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু + আদা + আলু =কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচ্চাল্বাদা হয় না।

আমরা প্রথমে খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। উল্লেখ্য, তৎসম সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা সন্ধি দুই রকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন–

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন – শত + এক = শতেক। এরূপ – কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন – শাঁখা + আরি = শাঁখারি। এরূপ – রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন – মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ – হিংসুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন – কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ – ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।
আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ – নদীর (নদী +এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন – যা + ইচ্ছা + তাই =যাচ্ছেতাই। এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

২। ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছোট্ + দা =ছোড্দা।

২. হলন্ত র্ (বন্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন– আর্ + না = আন্না, চার + টি = চাট্টি, ধর্ + না =ধন্না, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।

৩. চ–বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত–বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত–বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ–বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত–বর্গীয় ধ্বনি ও চ–বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন– নাত + জামাই =নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ্ + জাত =বজ্জাত, হাত + ছানি = হাচ্ছানি ইত্যাদি।

৪. 'প'–এর পরে 'চ' এবং 'স'–এর পরে 'ত' এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাঁশ্। সাত + শ = সাশ্, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্শিকা।

৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই =বোনাই, চুন + আরি =চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক =বারেক, তিন + এক =তিনেক।

৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ =নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জন সন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ–কার কিংবা আ–কারের পর অ–কার কিংবা আ–কার থাকলে উভয়ে মিলে আ–কার হয়, আ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ নর+ অধম = নরাধম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথার্থ। এরূপ – আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ– কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।
আ + ই = এ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।
অ + ঈ = এ পরম + ঈশ =পরমেশ।
আ + ঈ = এ মহা + ঈশ =মহেশ।

এরূপ –পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।
আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।
অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।
আ + ঊ = ও গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এরূপ – নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি।
আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ – অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = আর শীত + ঋত = শীতার্ত।
আ + ঋ = আর তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ –ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক।
আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব।
অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য।
আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ– হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

২০১৮

Scanned with CamScanner

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি।
আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি।
অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।
আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত
ই + ঈ = ঈ পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।
ঈ + ঈ = ঈ সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ– গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য(্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন–

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।
ই + আ = য্ + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।
ই + উ = য্ + উ অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।
ই + ঊ = য্ + ঊ প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ।
ঈ + আ = য্ + আ মসী + আধার = মস্যাধার।
ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।
ঈ + অ = য্ + অ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।

এরূপ–প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ মরু + উদ্যান = মরূদ্যান।
উ + ঊ = ঊ বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।
ঊ + উ = ঊ বধূ + উৎসব = বধূৎসব।
ঊ + ঊ = ঊ ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

Scanned with CamScanner

১১. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

উ + অ = ব + অ	সু + অল্প = স্বল্প।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অন্বিত।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈ = তন্বী।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অন্বেষণ।

এরূপ– পশ্বধম, পশ্বাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।
ও + অ = অব্ + অ	পো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।
ঔ + অ = আব্ + অ	পৌ + অক = পাবক।
ও + আ = অব্ + আ	গো + আদি = গবাদি।
ও + এ = অব্ + এ	গো + এষণা = গবেষণা।
ও + ই = অব্ + ই	পো + ইত্র = পবিত্র।
ঔ + ই = আব্ + ই	নৌ + ইক = নাবিক।
ঔ + উ = আব্ + উ	ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যথা – কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

Scanned with CamScanner

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ	দিক্ + অন্ত =দিগন্ত।
চ্ + অ = জ	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।
ট্ + আ = ড়	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।
প্ + অ = ব	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা–

অ + ছ = চ্ছ	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।
আ + ছ = চ্ছ	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
ই + ছ = চ্ছ	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

এরূপ – মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্–এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ	সৎ + চিন্তা =সচ্চিন্তা।
ত্ + ছ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়।
দ্ + ছ = চ্ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ – উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্–এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ	সৎ + জন = সজ্জন।
দ্ + জ = জ্জ	বিপদ + জাল =বিপজ্জাল।
ত্ + ঝ = জ্ঝ	ক্ষুৎ + ঝটিকা = ক্ষুজ্ঝটিকা।

এরূপ – উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

২০১৮

Scanned with CamScanner

৩. ত্ ও দ্-এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে চ্ এবং শ্-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

এরূপ – চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

৪. ত্ ও দ্–এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ + ড = ড্ড উৎ + ডীন = উড্ডীন।

এরূপ – বৃহড্ডক্কা।

৫. ত্ ও দ্ এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ্ এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

এরূপ – উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৬. ত্ ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ – উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লম্ফন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগ্দান।

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়্যন্ত্র।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন।

ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

ত্ + ব = দ্ + ব উৎ +বন্ধন = উদ্বন্ধন।

ত্ + র = দ্ + র তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

এরূপ -দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, সদ্গুরু, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :

ক্ + ন = গ্ঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্নির্ণয়।

ত্ + ম = দ্/ন্+ ম তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।

Scanned with CamScanner

লক্ষণীয় : এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। যেমন – বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এরূপ–উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা =শঙ্কা।

ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।

ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ – কিঙ্কৃত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম্-এর পর কণ্ঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন– সম্ + গত = সংগত, অহম্ + কার = অহংকার, সম্ + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–

সম্ + যম = সংযম, সম্ + বাদ = সংবাদ, সম্+ রক্ষণ = সংরক্ষণ,

সম্ + লাপ = সংলাপ সম্ + শয় = সংশয় সম্ + সার = সংসার,

সম্ + হার = সংহার।

এরূপ–বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বংসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্–এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

চ্ + ন = চ্ + ঞ, যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী =রাজ্ঞী।

জ্ + ন = জ্ + ঞ, যজ্ + ন = যজ্ঞ,

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্ > ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল

ধ্ > ত্ ক্ষুধ্ + পিপাসা =ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ – হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্–এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ষ্-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ।

Scanned with CamScanner

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি

উৎ + স্থান = উত্থান	সম্ + কার = সংস্কার,	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন,
সম্ + কৃত = সংস্কৃত,	পরি + কার = পরিষ্কার।	

এরূপ.- সংস্কৃতি, পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

আ+ চর্য = আশ্চর্য,	গো + পদ = গোষ্পদ,	বন্ + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি,	তৎ + কর = তস্কর,	পর্ + পর = পরস্পর,
মনস্ + ঈষা = মনীষা,	ষট্ + দশ = ষোড়শ	এক্ + দশ =একাদশ,
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।		

৩. বিসর্গ সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্মধ্বনি অর্থাৎ হ্ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. র্ – জাত বিসর্গ ও ২. স্ – জাত বিসর্গ।

১. র্ –জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র – জাত বিসর্গ । যেমন : অন্তর– অন্তঃ, প্রাতর– প্রাতঃ, পুনর – পুনঃ ইত্যাদি।

২. স্-জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্-জাত বিসর্গ। যেমন : নমস্ – নমঃ, পুরস্ – পুরঃ, শিরস্ – শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ-ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ – এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন– ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন– তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত র্-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন– অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ+ আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ।

এরূপ – পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুত্থান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তর্বর্তী ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ–এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন–

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ – নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লোভ, দুরন্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন – নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন–

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ	নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।
ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ঃ + ত / থ = স + ত / থ	দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুস্থ।

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ্ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন–

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক	নমঃ + কার = নমস্কার।
অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ	পদঃ + খলন = পদস্খলন।
ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	নিঃ + কর = নিষ্কর।
উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	দুঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন–

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন– নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ। দুঃ +স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ। নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশা = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সন্ধি

সন্ধি → মিলন বা একত্রিকরন।

অত + এক = অত্যেক

কুড়িক = কুড়ি + এক

সন্ধির উদ্দেশ্য
- স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা — মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
- ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন — রূপা + আলি = রূপালি

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়
(বাড়ি)

সু + অক্ষর = স্বাক্ষর

অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

সন্ধি
- স্বরসন্ধি
- ব্যঞ্জনসন্ধি
- বিসর্গ সন্ধি

স্বরসন্ধি

→ (স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি) মিলন হয়

স্বরসন্ধি = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি

কাঁসা + আরি = কাঁসারি → কোন স্বরধ্বনি লোপ পেয়েছে?
(আ + আ) = (আ) — (আ) " " "

কতেক = কত + এক
(এ) = অ + এ

যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই
(আ + ই) → লোপ পেয়েছে
= (এ)
"আ" হয়েছে "এ"

তৎসম সন্ধি

অ + অ = আ (প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক)
(আ) = (অ + অ)

আ + আ = আ (মহালয় = মহা + আলয়)

অ/আ + এ/ঐ = ঐ (সদৈব = সদা + এব; আ + এ)
(মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য; আ + ঐ)

অ/আ + ঋ = আর (দেবর্ষি = দেব + ঋষি)
(তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত)

আর = অ/আ + ঋ

অ + এ = এ (অ লোপ); কত + এক = কতেক
আ + আ = আ (আ "); কাঁসা + আরি = কাঁসারি
আ + উ = উ (আ "); মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
ই + এ = ই (এ "); কুড়ি + এক = কুড়িক

Scanned with CamScanner

ব্যঞ্জনসন্ধি

→ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে হয়

ছোট + দা = ছোড়দা

↓ অঘোষ, ↓ ঘোষ, ↓ (ঘোষ)

ট, ঠ → অঘোষ ধ্বনি

ড, দ → ঘোষ "

কাঁচা + কলা = কাঁচকলা

এখানে, কাঁচা → স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

↓

স্বরধ্বনি লোপ পাই

→ সংস্কৃত ভাষা → স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসর্গ সন্ধি বিবেচনা করা হয়

→ বাংলা ভাষা → বিসর্গ সন্ধি-কে সন্ধি হিসাবে বিবেচনা করে না

Scanned with CamScanner

নিপাতনে সিদ্ধ

কুল + অটা = কুলটা (~~কুলোটা~~) এটা হবে না। কোনো নিয়ম মানে না।

(অ) + (অ)

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (~~প্রোঢ়~~)

পর + পর = পরস্পর

Scanned with CamScanner

বিসর্গ সন্ধি

(সংস্কৃত শব্দে দেখা যায়)

বিসর্গ সন্ধি

র-জাত　　স-জাত

মনঃ + রম = মনোরম

(ঃ)　(ও)

বিসর্গ + ব্যঞ্জন

মনঃ + হর = মনোহর

ভাঃ + কর = ভাস্কর

অহর্নিশ = অহঃ নিশা

অহঃ + অহ = অহরহ

☞ পূর্বপদের শেষে অঃ থাকার পর পরপদের প্রথমে বর্গীয় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বা অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল) বা "হ" থাকলে সন্ধির ফলে অঃ স্থলে ও হয়।

Ex- সদ্যোজাত (সদ্যঃ + জাত)

Scanned with CamScanner

বিশেষ কিছু সন্ধি

কৃষ্টি = কৃষ্ + তি
(ষ্ট) = (ষ + ত)

পরস্পর = পর + পর (নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি)

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদ–প্রকরণ

দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য চাঁদের দেশে পৌঁছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওপরের বাক্যটিতে 'রা' (অভিযাত্রী + রা), 'এর' (মানুষ + এর), 'র' (কল্পনা + র), 'এ' (মঙ্গলগ্রহ + এ) প্রভৃতি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।

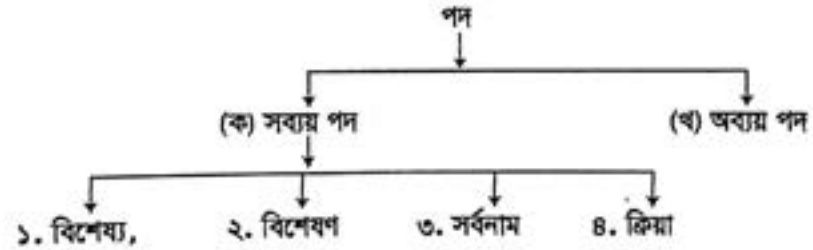

আলোচ্য বাক্যটিতে

১. বিশেষ্য পদ : অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ
২. বিশেষণ পদ : দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত
৩. সর্বনাম পদ : তাঁরা
৪. ক্রিয়াপদ : পৌঁছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া)
৫. অব্যয় পদ : এবং, জন্য

বিশেষ্য পদ (Noun)

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

Scanned with CamScanner

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

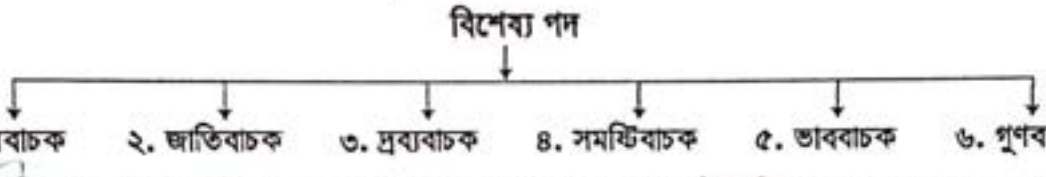

১. **সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য বলে। যথা–

(ক) ব্যক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল
(খ) ভৌগোলিক স্থানের : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা
(গ) ভৌগোলিক সংজ্ঞা : (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর
(ঘ) গ্রন্থের নাম : 'গীতাঞ্জলি', 'অগ্নিবীণা', 'দেশে বিদেশে', 'বিশ্বনবি'

২. **জাতিবাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ।

৩. **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য** : যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** : যে পদে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা–ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা– সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা– গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা–ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা–মধুর মিষ্টত্বের গুণ– মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ–তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ– তিক্ততা, তরুণের গুণ–তারুণ্য ইত্যাদি। তদ্রূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

২০১৮

Scanned with CamScanner

বিশেষণ পদ (Adjective)

বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

চলন্ত গাড়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।
করুণাময় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।
দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

বিশেষণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা–

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

ক. রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।
খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া।
গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।
ঙ. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।
চ. পরিমাণবাচক : বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।
ছ. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
জ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।
ঝ. প্রশ্নবাচক : কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক. ক্রিয়াজাত : হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
খ. অব্যয়জাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
গ. সর্বনাম জাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
ঘ. সমাসসিদ্ধ : বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
ঙ. ধ্বন্যাত্মক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।
চ. অনুকার অব্যয়জাত : কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।

Scanned with CamScanner

ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।

জ. তদ্ধিতান্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।

ঝ. উপসর্গযুক্ত : নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।

ঞ. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।

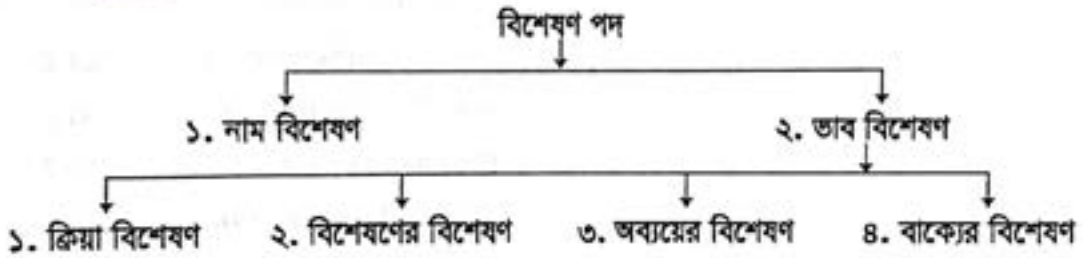

১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা–

ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা–

ক. নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা– ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন–

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

Scanned with CamScanner

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা–

গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা–

নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা–

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন– এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন– গুরু–গুরুতর–গুরুতম। দীর্ঘ–দীর্ঘতর–দীর্ঘতম।

কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন– অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন– মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়		বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	(বাংলায় ব্যবহার নেই)	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান		কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান		জ্যেষ্ঠ
প্রেয়	শ্রেয়ান		শ্রেষ্ঠ।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ : তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিমই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন— ভূয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন –

ভালো	:	বিশেষণ রূপে	–	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
		বিশেষ্য রূপে	–	আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ	:	বিশেষণ রূপে	–	মন্দ কথা বলতে নেই।
		বিশেষ্য রূপে	–	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
পুণ্য	:	বিশেষণ রূপে	–	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
		বিশেষ্য রূপে	–	পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	:	বিশেষণ রূপে	–	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
		বিশেষ্য রূপে	–	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	:	বিশেষণ রূপে	–	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
		বিশেষ্য রূপে	–	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	:	বিশেষণ রূপে	–	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
		বিশেষ্য রূপে	–	এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন— হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

Scanned with CamScanner

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।

(২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

(৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।

(৪) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব।

(৫) সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।

(৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?

(৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।

(৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।

(৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।

(১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

১. ব্যক্তিবাচক	২. আত্মবাচক
৩. সামীপ্যবাচক	৪. দূরত্ববাচক
৫. সাকল্যবাচক	৬. প্রশ্নবাচক
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	৮. ব্যতিহারিক
৯. সংযোগজ্ঞাপক	১০. অন্যাদিবাচক

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার।

১. **উত্তম পুরুষ** : স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।

২. **মধ্যম পুরুষ** : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

Scanned with CamScanner

৩. নাম পুরুষ: অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ)।

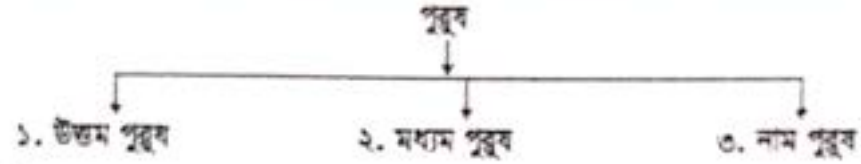

পুরুষ
↓
১. উত্তম পুরুষ ২. মধ্যম পুরুষ ৩. নাম পুরুষ

ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ

পুরুষভেদে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায় : মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সম্মানাত্মক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, তাঁদেরকে, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইঁহাদের, এঁদের, ইঁহাকে, এঁকে, উনি, ওঁর, ওঁরা, ওঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারকে বিভক্তিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলা হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমার একবচন		অন্যান্য কারকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ	
সাধারণ	সম্মানাত্মক	তুচ্ছার্থক	সম্মানাত্মক	তুচ্ছার্থক
আমি				
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাঁহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি		যাঁহা, যাঁ	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইঁহা, এঁ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উঁহা, ওঁ	উহা, ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

Scanned with CamScanner

জ্ঞাতব্য

১. চলিত ভাষায়–

(ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।

(খ) সম্ভ্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু সংযোজিত হয়। যথা– তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)। (সম্ভ্রমার্থে) তাঁহা + দের = তাঁহাদের (সাধু) > তাঁদের (চলিত)।

২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন– তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।

৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়-প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যথা : মৎ+ ঈয় = মদীয়, ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়, তৎ+ ঈয় = তদীয়।

৪. 'কী' সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে 'কিসে' বা (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে) 'কীসের' রূপ গ্রহণ করে। যথা : কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা– 'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে'। 'দীনের আরজ'।

২. ছন্দবন্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমরা' স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন – 'কে বুঝিবে ব্যথা মম'। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি। বাংলা ভাষা'। 'ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি কল্পনা'।

৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন– (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।'

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।

৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে– বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

Scanned with CamScanner

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, নৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।

২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে : ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।

৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, হুল হুল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার : ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্বয়ী, ৩. অনুসর্গ, ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

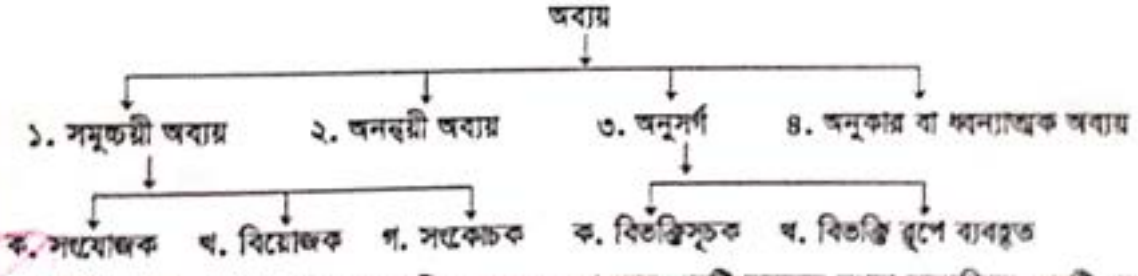

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

(i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।

(ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই' অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে।

আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

(i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।

এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।

(ii) 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।

আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক।

বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

Scanned with CamScanner

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

ক.	উচ্ছ্বাস প্রকাশে	:	মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
খ.	স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ.	সম্মতি প্রকাশে	:	আমি আজ অবশ্যই যাব। নিশ্চয়ই পারব।
ঘ.	অনুমোদনবাচকতায়	:	আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।
ঙ.	সমর্থনসূচক জবাবে	:	আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ.	যন্ত্রণা প্রকাশে	:	উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ.	ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	:	ছি ছি, তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ.	সম্বোধনে	:	'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
ঝ.	সম্ভাবনায় :		'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে পাছে লোকে কিছু বলে।'

ঞ. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন–

১. কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।

২. 'হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার : ক. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

Scanned with CamScanner

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা–

বজ্রের ধ্বনি– কড় কড়	মেঘের গর্জন – গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ – ঝম ঝম	সিংহের গর্জন – গর গর
স্রোতের ধ্বনি – কল কল	ঘোড়ার ডাক – চিহি চিহি
বাতাসের গতি – শন শন	কাকের ডাক– কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ – মর মর	কোকিলের রব – কুহু কুহু
নূপুরের আওয়াজ – রুম ঝুম	চুড়ির শব্দ – টুং টাং

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা–

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা–

নাম-বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ভাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ–যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. ত (সংস্কৃত তস্) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা – ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর – পুনরাবৃত্তি অর্থে	:	ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে	:	বল, আর কী চাও?
নিরাশায়	:	সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকারে	:	আর কি বাজবে বাঁশি?

২০১৮

Scanned with CamScanner

২. ও – সংযোগ অর্থে	:	করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায়	:	আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায়	:	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে	:	এত চেষ্টাতেও হলো না।
৩. কি/কী–জিজ্ঞাসায়	:	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরক্তি প্রকাশে	:	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে	:	কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে	:	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
৪. না–নিষেধ অর্থে	:	এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে	:	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	:	আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	:	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিস্ময়ে	:	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!
তুলনায়	:	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
৫. যেন – উপমায়	:	মুখ যেন পদ্মফুল।
প্রার্থনায়	:	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	:	ইস্, ঠাণ্ডা যেন বরফ।
অনুমানে	:	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্কীকরণে	:	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	:	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উত্তরের মধ্যে সর্বোত্তম উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(i) পদ কয় প্রকার?

ক. চার
খ. পাঁচ
গ. ছয়
ঘ. সাত

Scanned with CamScanner

"পদ-প্রকরণ"

* **পদ:** "বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই পদ।"

* পদ প্রকার ভেদ-

প্রধানত দুই প্রকার- যথা- (১) সব্যয় পদ (২) অব্যয় পদ

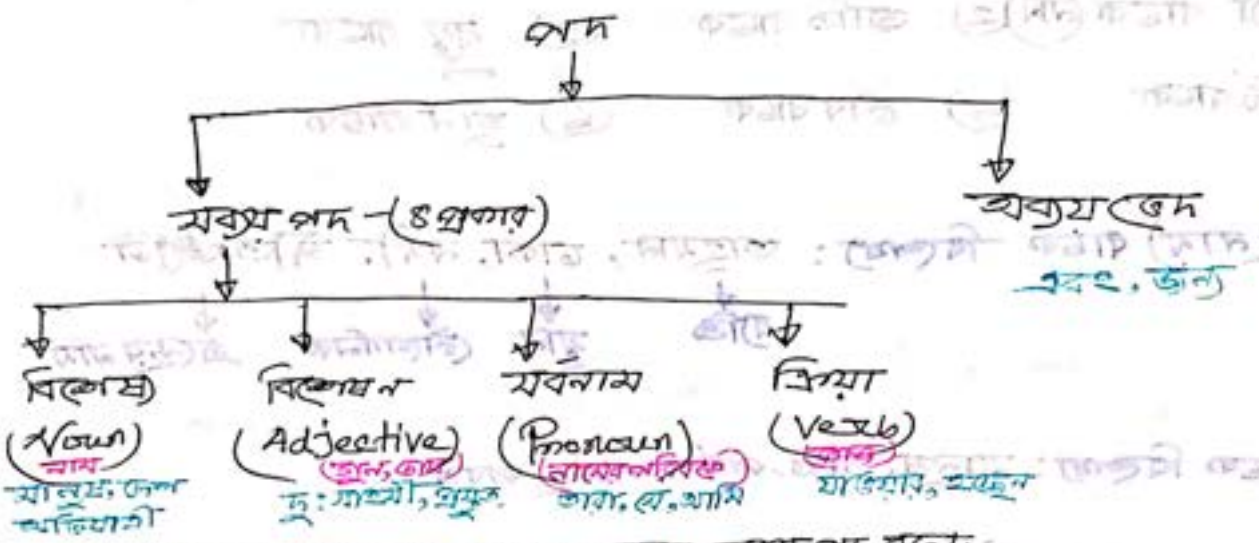

- পদ
  - সব্যয় পদ -(৪ প্রকার)
    - বিশেষ্য (Noun) (নাম) — মানুষ, জল, অধিবাসী
    - বিশেষণ (Adjective) (গুণ, দোষ) — দ্র: সাহসী, সুন্দর
    - সর্বনাম (Pronoun) (নামের পরিবর্তে) — তারা, সে, আমি
    - ক্রিয়া (Verb) (কাজ) — যাওয়া, খেলুন
  - অব্যয় ভেদ — এবং, জন্য

সব্যয় পদ: যার ব্যয় আছে তাকে সব্যয় পদ বলে।

Scanned with CamScanner

বিশেষ্য পদ (Noun) (ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম)

☆ বিশেষ্য পদ: কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

↗ আজ আমরা তুরিনের বাসায় যাবো।

বিশেষ্য পদ কত প্রকার। যথা—

(১) সংজ্ঞা বাচক (নাম) (২) জাতি বাচক (৩) বস্তু বাচক
(৪) সমষ্টি বাচক (৫) ভাব বাচক (৬) গুণ বাচক

☆ সংজ্ঞা (নাম) বাচক বিশেষ্য: আরমান, ঢাকা, নদী, গীতাঞ্জলি
(আরমান → ব্যক্তি, ঢাকা → স্থান, নদী → ভৌগোলিক, গীতাঞ্জলি → গ্রন্থের নাম)

☆ জাতি বাচক বিশেষ্য: মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত

☆ বস্তু " " : বই, খাতা, কলম

☆ সমষ্টি " " : সভা, জনতা, সমিতি

☆ ভাব " " : গমন, দর্শন, ভোজন

☆ গুণ " " : মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

Scanned with CamScanner

বিশেষণ পদ (Adjective) (দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ)

বিশেষণ পদ: বিশেষ্য সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের অবস্থা বর্ণনা করে

- বিশেষণ পদ
  - নাম বিশেষণ (বিশেষ্য সর্বনাম)
    - নীল আকাশ (নাম বিশেষণ)
  - ভাব বিশেষণ (ক্রিয়াপদ)
    - ক্রিয়া বিশেষণ (ধীরে ধীরে, পরে)
    - বিশেষণের বিশেষণ (সামান্য, অতিশয়, অতি)
    - অব্যয়ের বিশেষণ (ধিক, অনেক কিঞ্চিৎ)
    - বাক্যের বিশেষণ (দুর্ভাগ্যক্রমে, বাস্তবিক)

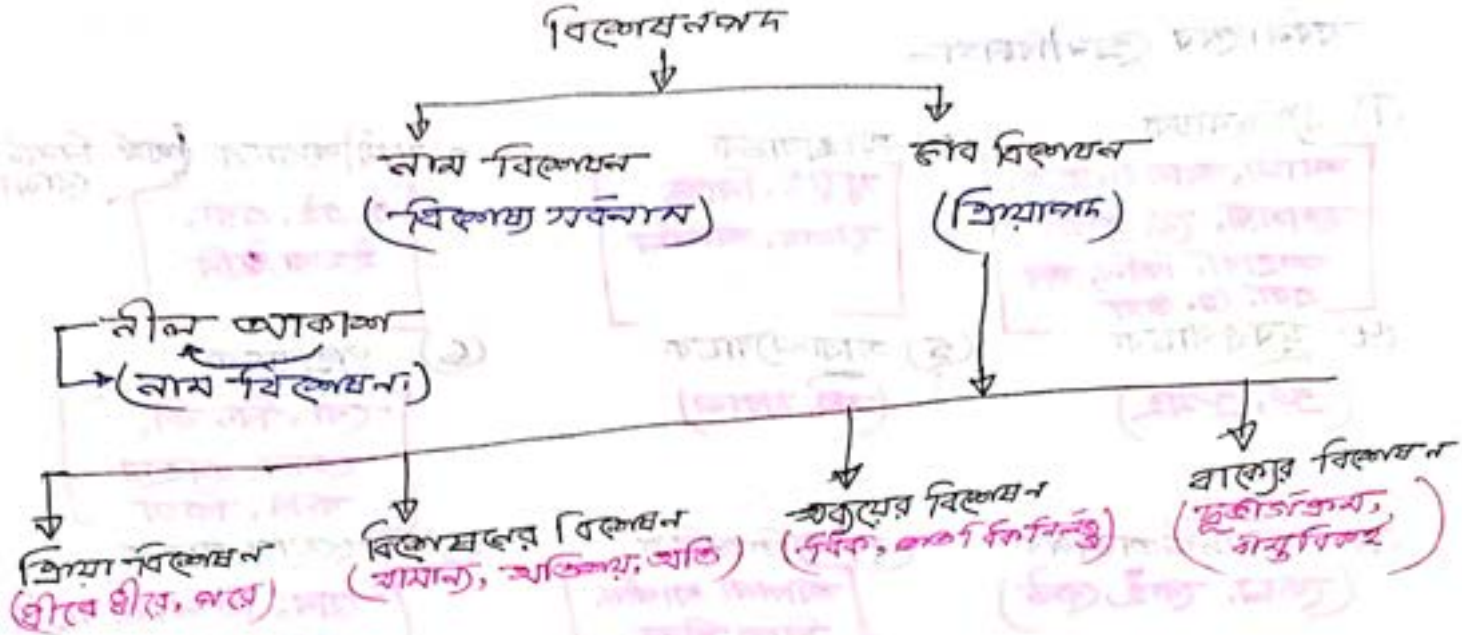

☐ বিশেষণের অতিশায়ন:

যেমন- যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

☐ বাংলা শব্দের অতিশায়ন - হতে, থেকে, চেয়ে

Scanned with CamScanner

সর্বনামপদ (Pronoun)

(তার, সে, তাহার, তারা) অর্থাৎ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যেটি ব্যবহৃত হয়।

প্র/ সর্বনাম পদ: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ-

১) ব্যক্তিবাচক
[আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তার, এরা, ও, ওরা]

২) আত্মবাচক
[স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি]

৩) সামীপ্যবাচক (অর্থ নিকটে বোঝায়)
[এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি]

৪) দূরত্ববাচক
(ঐ, ঐসব)

৫) সাকল্যবাচক
(সব, সকল)

৬) প্রশ্নবাচক
[কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে]

৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক
(কোন, কেই, কেউ)

৮) ব্যতিহারিক
[আপনা আপনি, নিজে নিজে, পরস্পর]

৯) সংযোগজ্ঞাপক
(যেন, যিনি, যারা, যাহারা)

Scanned with CamScanner

অব্যয় পদ

❖ অব্যয়পদ: অব্যয় (ন ব্যয়)। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় তাই অব্যয় পদ।

অব্যয়ের প্রকারভেদ-

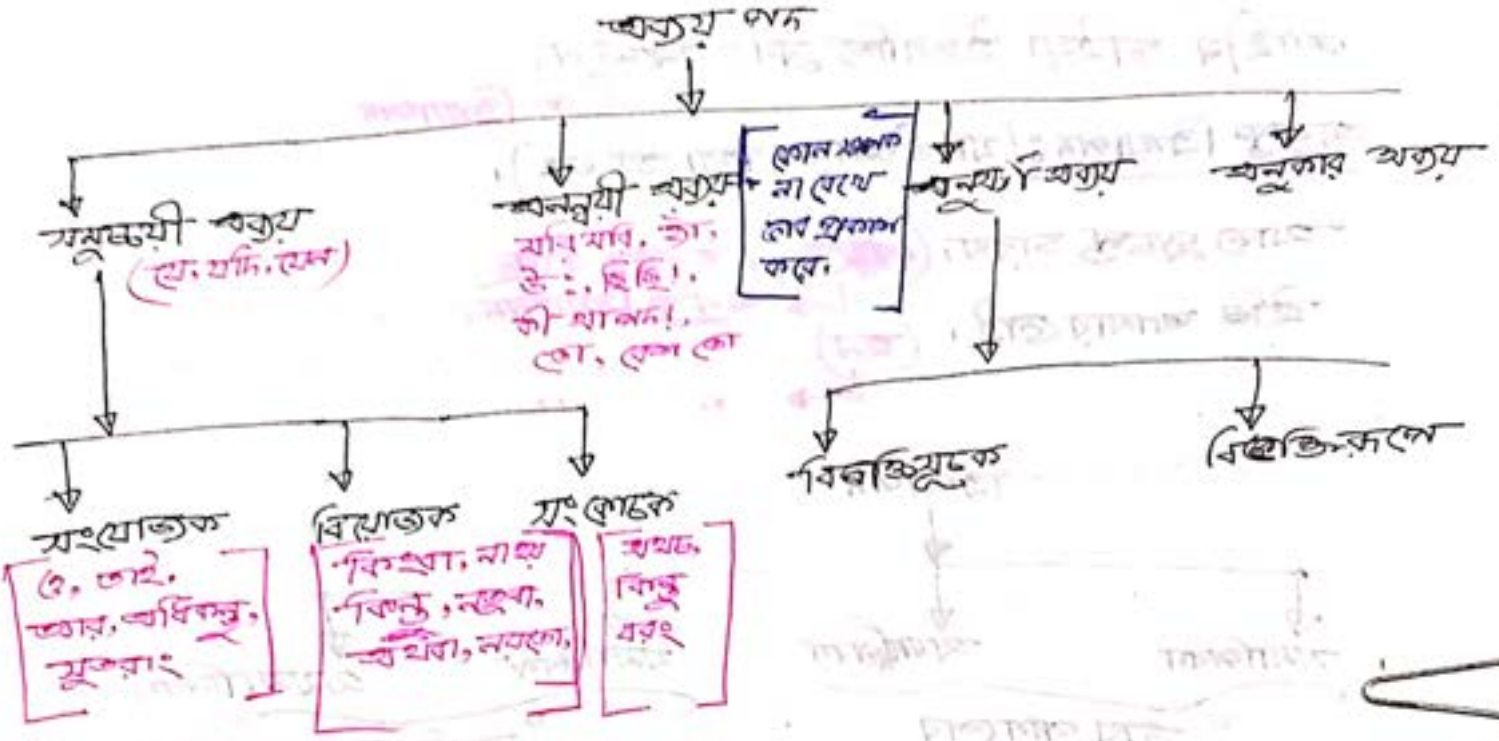

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রিয়াপদ

১. কবির বই পড়ছে।

২. তোমরা আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

'পড়ছে' এবং 'দেবে' পদ দুটো দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝাচ্ছে বলে এরা ক্রিয়াপদ।

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ওপরের প্রথম উদাহরণে নাম পুরুষ 'কবির' কর্তৃক বর্তমান কালে 'পড়া' কার্যের সংঘটন প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যম পুরুষ, 'তোমরা' ভবিষ্যৎ ক্রিয়া সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়াপদের গঠন : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমন–

'পড়ছে' – পড়্ 'ধাতু' + 'ছে' বিভক্তি।

অনুক্ত ক্রিয়াপদ : ক্রিয়াপদ বাক্যগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তবে কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। যেমন–

ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।

আজ প্রচণ্ড গরম = আজ প্রচণ্ড গরম (অনুভূত হচ্ছে)।

তোমার মা কেমন? = তোমার মা কেমন (আছেন)?

বাক্যে সাধারণত 'হ্' এবং 'আছ্' ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিবিধ অর্থে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–ক সমাপিকা ক্রিয়া, এবং খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – ছেলেরা খেলা করছে। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন–

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে .....

২. আমরা হাত-মুখ ধুয়ে .....

Scanned with CamScanner

৩. আমরা বিকেলে খেলতে .....

এখানে, 'উঠলে' 'ধুয়ে' এবং 'খেলতে' ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঁড়াবে–

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।

২. আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।

৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে),এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।

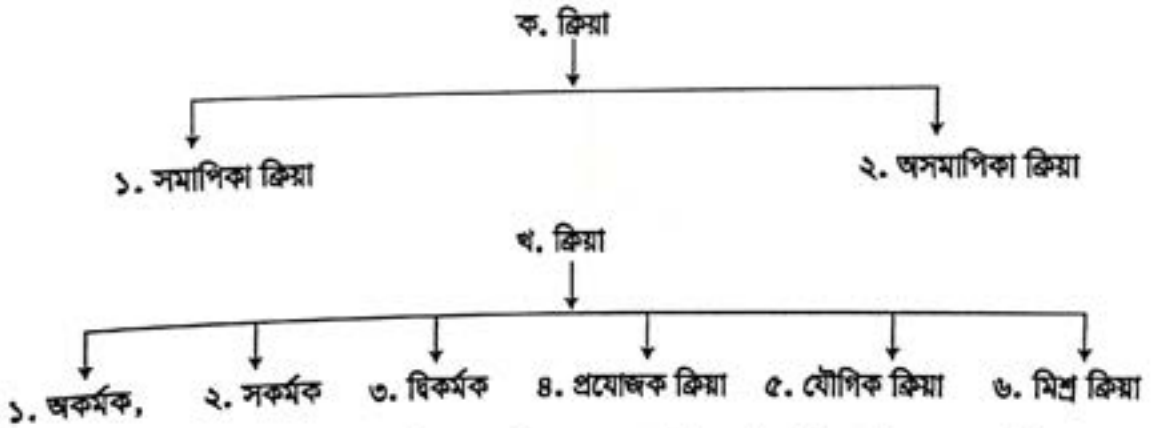

২. সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা–ই **সকর্মক ক্রিয়া**। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা–ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন–বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন? উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন? উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা **অকর্মক ক্রিয়া**। যেমন–মেয়েটি হাসে। 'কী হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে **মুখ্য বা প্রধান কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে **গৌণ কর্ম** বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে **সমধাতুজ কর্ম** বা

Scanned with CamScanner

ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন– আর কত খেলা খেলবে। মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন–

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন–

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন–

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু+ আ। যেমন মূল ধাতু √হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা +চ্ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া–বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন–

ক. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা–
কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন –দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস – অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

আ-প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক - তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা- আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

৫। যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।

খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।

গ. কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

ঘ. আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।

ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।

চ. অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

৬। মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-

ক. বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। এখন গোল্লায় যাও।

খ. বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে) : মাথা ঝিম ঝিম্ করছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

২. এখন বাড়ি যাও।

৩. সে পড়লে পাশ করত।

৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপরের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)

২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)

৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)

২০১৮

Scanned with CamScanner

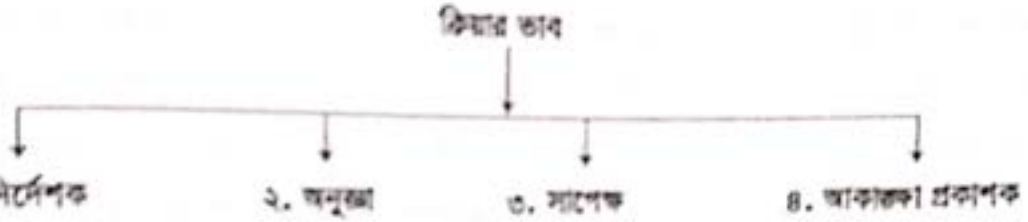

১. **নির্দেশক ভাব :** সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়। যথা–

ক. সাধারণ নির্দেশক : আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।

খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় : আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২. **অনুজ্ঞা ভাব :** আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন–

ক. আদেশাত্মক : বর্তমান কালে – চুপ কর।
: ভবিষ্যৎ কালে – তুমি কাল যেও।

খ. নিষেধাত্মক : বর্তমান কালে – অন্যায় কাজ করো না।
: ভবিষ্যৎ কালে – মিথ্যা বলবে না।

গ. অনুরোধসূচক : বর্তমান কালে – ছাতাটা দিন তো ভাই।
: ভবিষ্যৎ কালে – আপনারা আসবেন।

ঘ. উপদেশাত্মক : বর্তমানে কালে – মন দিয়ে পড়।
: ভবিষ্যৎ কালে – স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩. **সাপেক্ষ ভাব :** একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন–

ক. **সম্ভাবনায় :** তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।

খ. **উদ্দেশ্য বোঝাতে :** ভালো করে পড়লে সফল হবে।

গ. **ইচ্ছা বা কামনায় :** আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

৪. **আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব :** যে ক্রিয়াপদে বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন–সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ: যে পদের মাধ্যমে কোন কার্য সংঘটন বোঝানো হয়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

শাহীন ভাইয়া ইংরেজি ক্লাস নিচ্ছেন।
→ ক্রিয়াপদ

অনুক্ত ক্রিয়াপদ: (যা উচ্চারণ করা হয় না)।

আজ প্রচণ্ড গরম। (পড়েছে) / অনুক্ত হচ্ছে
→ অনুক্ত ক্রিয়াপদ।

ইনি আমার ভাই। (হন)
→ " "

ক্রিয়াপদ
- সমাপিকা
- অসমাপিকা

"ভাব প্রকাশের দিক থেকে"

- সমাপিকা
- অসমাপিকা

"কর্মপদের উপস্থিতির দিক থেকে"

⇒ মুস্তাফিজ বোলিং করছে।
→ (সমাপিকা) যেটা দিয়ে বাক্য শেষ হয়। (সমাপ্ত হলে সমাপিকা)

⇒ মুস্তাফিজ বোলিং করতে করতে ক্লান্ত।
→ (অসমাপিকা) যেটা দিয়ে বাক্য শেষ হয় না। (অসমাপ্ত হলে অসমাপিকা)

⇒ আমি বই পড়ি।
→ ক্রিয়াপদ
→ কর্মপদ

⇒ ক্রিয়াপদকে "কি" দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মপদ পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

➪ মেয়েটি হাসে।
- হাসে → ক্রিয়াপদ
- মেয়েটি → বিশেষ্য পদ

সমধাতুজ কর্ম: (সম+ধাতু) বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম পদ একই ধাতু থেকে গঠিত।

চলা = চল্ + আ
- চলা → ক্রিয়ামূল
- চল্ → ধাতু
- আ → প্রত্যয়

➪ খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছে।
- ঘুম → কর্মপদ
- ঘুমিয়েছে → ক্রিয়াপদ

➪ আর কত খেলা খেলবে।
- খেলা → খেল্ (ধাতু) / কিংবা কর্মপদ
- খেলবে → ক্রিয়াপদ

➪ **কর্মপদ:** যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মপদ বলে।

➪ **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:**

➪ বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন।
- দিয়েছেন → দ্বিকর্মক ক্রিয়া
- কলম → কর্মপদ (কি দিয়েছে "কলম" দিয়েছে) → মুখ্য কর্ম (বস্তুবাচক বলা হয়)
- আমাকে → কর্মপদ (কাকে দিয়েছে "আমাকে") → গৌণ কর্ম (প্রাণিবাচক বলা হয়)

➪ **প্রযোজক ক্রিয়া:** যে কর্তাকে প্রযোজনা করে।

➪ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
- দেখাচ্ছেন → প্রযোজক ক্রিয়া
- শিশুকে → প্রযোজ্য কর্তা
- মা → প্রযোজক কর্তা

➪ শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।
- পড়াচ্ছেন → প্রযোজক ক্রিয়া
- ছাত্রদের → প্রযোজ্য কর্তা
- শিক্ষক → প্রযোজক কর্তা

Scanned with CamScanner

যৌগিক ক্রিয়া: সমাপিকা + অসমাপিকা ক্রিয়া।

⇨ বর্ষাতি খুলে রাখ।
→ সমাপিকা ক্রিয়া (বাক্যের শেষে থাকে)
→ অসমাপিকা ক্রিয়া (,, মধ্যে ,,)

মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত হয়।

⇨ তাজমহল দর্শন করলাম।

⇨ মাথা ঝিম ঝিম করছে।
→ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

⇨ তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
(খুশি) → মিশ্র ক্রিয়া
→ ক্রিয়া
→ বিশেষণ

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য প্রকরণ / পরিবর্তন

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক। এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন –

(১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি এবং (৩) যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন – 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসত্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন –

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন – বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। – এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।' – বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

(ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

শব্দ	রীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয় বিশেষ কোনো শস্যের রস	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ

(খ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন – তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

(গ) উপমার ভুল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন –

আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) বাহুল্য–দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'আলেমগণ' বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য–দোষ সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগ্‌ধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন – 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন)–এর পরিবর্তে যদি বলা হয়।, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

(চ) গুরুচণ্ডালী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন –

খোকা এখন	বই পড়ছে
(উদ্দেশ্য)	(বিধেয়)

বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন –

সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী। – বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ।

মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়। – ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

২০১৮

Scanned with CamScanner

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ:	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
১. বিশেষণ যোগে–	কুখ্যাত	দস্যুদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে–	হাসিমের	ভাই	এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে–	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	তারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে–	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে–	যার কথা তোমরা বলে থাক,	তিনি	এসেছেন।
বিধেয়ের সম্প্রসারণ:	**উদ্দেশ্য**	**সম্প্রসারণ**	**বিধেয়**
১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে–	ঘোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে–	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে–	ভুবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশে যোগে–	তিনি	যে ভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে–	ইনি	আমার বিশেষ	অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিন প্রকার : (১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা – পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে 'পদ্মফুল' উদ্দেশ্য এবং 'জন্মে' বিধেয়।

এ রকম : বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা–

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
১. যে পরিশ্রম করে,	সে–ই সুখ লাভ করে।
২. সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার : (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

২০১৮

Scanned with CamScanner

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Noun clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

–আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)

অন্যরূপ : তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adjective clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

–লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

অন্যরূপ : 'ধাঁটি সোনার চাইতে ধাঁটি, আমার দেশের মাটি'।

'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।'
যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগা।

গ) ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন –

'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।'

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।
যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য : যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন –

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

২০১৮

Scanned with CamScanner

ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

১.	সরল বাক্য	:	ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
	মিশ্র বাক্য	:	যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২.	সরল বাক্য	:	তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
	মিশ্র বাক্য	:	যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
৩.	সরল বাক্য	:	ভিক্ষুককে দান কর।
	মিশ্র বাক্য	:	যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর : মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

১.	মিশ্র বাক্য	:	যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
	সরল বাক্য	:	নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
২.	মিশ্র বাক্য	:	যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
	সরল বাক্য	:	আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।
৩.	মিশ্র বাক্য	:	যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
	সরল বাক্য	:	মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

১.	সরল বাক্য	:	তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
	যৌগিক বাক্য	:	তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
২.	সরল বাক্য	:	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
	যৌগিক বাক্য	:	এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
৩.	সরল বাক্য	:	আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
	যৌগিক বাক্য	:	আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

২০১৮

Scanned with CamScanner

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে

(১) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

(২) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

(৩) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

(৪) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেত্বর্থবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

(১) যৌগিক বাক্য : সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

(২) যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

(৩) যৌগিক বাক্য : মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

ঙ. যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

(২) যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা :
যৌগিক বাক্য : এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য : এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

চ. মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) মিশ্র বাক্য : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

(২) মিশ্র বাক্য : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য : বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

(৩) মিশ্র বাক্য : যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য : তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

Scanned with CamScanner

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা : বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য বিশ্লেষণ বলে।

ক. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন।

২. ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা) দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন।

ওপরে লিখিত বাক্য দুটিকে (১) উদ্দেশ্য, (২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, (৩) বিধেয়, (৪) বিধেয়ের সম্প্রসারক – এ চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
(১) মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র	শাক্যসিংহে	যৌবনে সংসার	ত্যাগ করেন।
(২) ইসলামের প্রথম খলিফা	হযরত আবু বকর (রা)	দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব	দান করেছিলেন।

খ. মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. খণ্ডবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান এবং অপ্রধান খণ্ডবাক্যের মধ্যে কোনো সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন–আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য–(১) আমি স্থির করলাম; সংযোজক পদ–যে; বিশেষ্য–স্থানীয় খণ্ডবাক্য – (২) অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়
(১)	আমি	অল্প বয়স্ক বালককে	স্থির করলাম	যে
(২)	(আমি)		পাঠাব না।	এবং
	(উহ্য)			

Scanned with CamScanner

গ. যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. কোনো সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন – ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দুটি বাক্য আছে। যেমন –

(১) ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

(২) জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দুটির সংযোজক অব্যয় 'এবং'।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক অব্যয়
(১)	ত্যাগ	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	এবং
(২)	জ্ঞান	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	

বাক্য সংক্ষেপণ

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর। এখানে বাক্য সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বাক্য সংক্ষেপণের বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ

অকালে পক্ক হয়েছে যা – অকালপক্ক।

অক্ষির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – অনভিজ্ঞ।

অহংকার নেই যার – নিরহংকার।

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম।

অনুতে (বা পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।

আকাশে বেড়ায় যে – আকাশচারী, খেচর।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার – আচারনিষ্ঠ।

আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা – আত্মকেন্দ্রিক।

আপনাকে যে পন্ডিত মনে করে–পন্ডিতম্মন্য।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – আস্তিক।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি – ঐতিহাসিক।
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়।
ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার – আঁষটে।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না – অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন।
একই মাতার উদরে জাত যে –সহোদর।
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত – একাদিক্রমে।
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী – কর্মঠ।
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না – অনিবার্য।
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত –চাক্ষুষ।
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত।
তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শী।
দিনে যে একবার আহার করে – একাহারী।
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর।
নদী মেখলা যে দেশের – নদীমেখলা।
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে – নাবিক।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক।
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি।
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী।
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন।
মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু।
যা দমন করা যায় না – অদম্য।
যা দমন করা কষ্টকর – দুর্দমনীয়।
যা নিবারণ করা কষ্টকর – দুর্নিবার।
যা পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি।

Scanned with CamScanner

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে – সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব।
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই – অকুতোভয়।
যার আকার কুৎসিত – কদাকার।
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে – অযত্নলব্ধ।
যা বার বার দুলছে – দোদুল্যমান।
যা দীপ্তি পাচ্ছে – দেদীপ্যমান।
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন – অনন্যসাধারণ।
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন – অদৃষ্টপূর্ব।
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়।
যা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ।
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে – অধীত।
যা জলে চরে – জলচর।
যা স্থলে চরে – স্থলচর।
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর।
যা বলা হয়নি – অনুক্ত।
যা কখনো নষ্ট হয় না – অবিনশ্বর।
যা মর্ম স্পর্শ করে – মর্মস্পর্শী।
যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য।
যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না – অজ্ঞাতকুলশীল।
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না – বর্ণচোরা।
যা চিন্তা করা যায় না – অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য।
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু–কর্কশ।
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়–ব্যয়বহুল।
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
যার বিশেষ খ্যাতি আছে – বিখ্যাত।
যা আঘাত পায়নি – অনাহত।
যা উদিত হচ্ছে – উদীয়মান।
যার অন্য উপায় নেই – অনন্যোপায়।
যার কোনো উপায় নেই – নিরুপায়।

Scanned with CamScanner

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে– বর্ধিষ্ণু।
যা পূর্বে শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব।
যে শুনেই মনে রাখতে পারে – শ্রুতিধর।
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় – স্বয়ংবরা।
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না – বনস্পতি।
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে – হাতুড়ে।
যে নারীর সন্তান বাঁচে না – মৃতবৎসা।
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – অগাছা।
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরগাছা।
যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার।
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি – অনূঢ়া।
যে ক্রমাগত রোদন করছে – রোরুদ্যমান ।
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না– অপরিণামদর্শী।
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী।
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসংবাদ) নেই – অবিসংবাদিত।
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ – শ্বাপদসংকুল।
যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী।
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় – সর্বংসহা।
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ।
যে নারীর কোনো সন্তান হয় না – বন্ধ্যা।
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে – কাকবন্ধ্যা।
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর – সুদর্শন।
যে রব শুনে এসেছে – রবাহূত।
লাভ করার ইচ্ছা – লিপ্সা।
শুভ ক্ষণে জন্ম যার – ক্ষণজন্মা।
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা – প্রত্যুদ্গমন।
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সর্বজনীন।
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা।

Scanned with CamScanner

বাক্য পরিবর্তন

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ-

(১) সরল বাক্য (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য (৩) যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য

⇒ সরল বাক্য: একটি মাত্র কর্তা + একটি সমাপিকা ক্রিয়া

⇒ সাকিব আল হাসান ভাল বোলিং করছে।
(সাকিব আল হাসান → কর্তা; বোলিং করছে → সমাপিকা ক্রিয়া)

বসতে করতে
চলতে বলতে } অসমাপিকা ক্রিয়া

⇒ মিশ্র বা জটিল বাক্য: একটি প্রধান খণ্ড বাক্য + একাধিক আশ্রিত খণ্ডবাক্য

⇒ যে-ই পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
(যে-ই পরিশ্রম করে → আশ্রিত খণ্ডবাক্য; সেই সুখ লাভ করে → প্রধান খণ্ডবাক্য)
যেখানে, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা কোন কিছুর অভাব থাকে না, সেইটা প্রধান বাক্য হবে।

মিশ্র বাক্য - বৈশিষ্ট্য:

(১) সাপেক্ষতা থাকবে
(২) নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় থাকবে
(৩) দুইটি উদ্দেশ্য থাকবে।

⇒ (সে) যত বেশি কাজ করে, (সে) সফল হয়।
(সে ... সে → নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়)

Scanned with CamScanner

যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়।

এবং, ও, আর, তাই → সংযোজক অব্যয়

আমি বাসায় গিয়েছি এবং সে ক্লাসে গিয়েছে।

এবং ↓ অব্যয় শব্দ

অথবা, কিন্তু → বিয়োজক অব্যয়

বাক্য রূপান্তর / পরিবর্তন

☐ বাক্য পরিবর্তন: অর্থের কোন রূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারে রূপান্তর

(ক) সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর:

(১) সরল বাক্য: ভালো বোলারেরা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দশ উইকেট নিতে পারে।

মিশ্র বাক্য: যারা ভালো বোলাররা তারা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দশ উইকেট নিতে পারে

(২) সরল বাক্য: ভিক্ষুককে দান করো

মিশ্র বাক্য: যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
অথবা, যে ভিক্ষুক তাকে দান করো

(৩) সরল বাক্য: তার আসামাত্রই আমরা চলে গেলাম।
মাত্রই প্রত্যয়

মিশ্র বাক্য: যখনই সে আসল, তখনই আমরা চলে গেলাম।

Scanned with CamScanner

(ঘ) মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

(1) মিশ্রবাক্য: যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

সরল বাক্য: বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

ঙ মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

মিশ্র বাক্য: যদি সে কাল যাবে, তাহলে আমি যেলব।

যৌগিক বাক্য: সে কাল যাবে এবং আমি যেলব।

Scanned with CamScanner

(১৮) সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

এবং, ও, আর → অব্যয়

(১) সরল বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

Scanned with CamScanner

(ঘ) যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে:

(1) যৌগিক বাক্য: তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

সরল বাক্য: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

Scanned with CamScanner

"1971"-এর বাংলাদেশ

২ মার্চ - 1971

① প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় - ২ মার্চ।

② পতাকা উত্তোলন করেন - আ.স.ম আব্দুর রব (ডাকসুর ভি.পি)

③ এই পতাকা উত্তোলন করা হয় - DU-এর কলা ভবন চত্তরে।

④ প্রথম পতাকার ডিজাইনার - শিব নারায়ন দাস।

⑤ বর্তমান " " - কামরুল হাসান।

৩ মার্চ - 1971

① ১ম স্বাধীনতার ইশতেহার দেওয়া হয়।

② " " - পাঠ করেন শাহজাহান সিরাজ (ছাত্র লীগের সাধারন সম্পাদক)

③ এই দিনে "বঙ্গবন্ধু"কে জাতির জনক উপাধি দেওয়া হয়।

④ বঙ্গবন্ধুকে উপাধি দেন "তোফায়েল আহমেদ।"

⑤

৭ মার্চ-১৯৭১ (রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

(1)

Scanned with CamScanner

২৩ মার্চ - 1971

① এই দিন হলো পাকিস্তান দিবস,

② বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়,

২৫ মার্চ (অপারেশন সার্চলাইট)

① এই সময়ের যারা সংগ্রাম গড়ে তোলে (বিদ্রোহ করে)

EPR → East Pakistan Rifles.

রাজারবাগ পুলিশ লাইন, এরা প্রথম বিদ্রোহ গড়ে তোলে.

২৬ মার্চ (স্বাধীনতা দিবস)

① কে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষনা দেই, এম.এ. হান্নান (চট্টগ্রাম থেকে) (আওয়ামীলীগ নেতা)

→ ২৬মার্চেই শেখ মুজিবকে আটক করা হয়.

② এরই ঘোষনা দেন, জিয়াউর রহমান (বঙ্গবন্ধুর পক্ষে) (চট্টগ্রাম থেকে)

১০ এপ্রিল (মুজিব নগর দিবস)

① মুজিব নগর সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল-মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা

② মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী কোথায় ছিল, ৮নং থিয়েটার রোড, কোলকাতা.

③ মুজিব নগর স্মৃতিসৌধ স্থপতি কে, তানভীর কবির.

→ রাষ্ট্রপতি – শেখ মুজিবুর রহমান (জাতির পিতা)

চার নেতা

→ প্রধানমন্ত্রী – তাজউদ্দীন আহমেদ (বাংলাদেশের [illegible]) –

→ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম –

→ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী – এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান –

→ অর্থমন্ত্রী – এম. মনসুর আলী –

→ প্রধান সেনাপতি – এম. এ. জি. ওসমানি. (কর্নেল)

মুজিবনগর সরকার

□ 1975 সালের 3 নভেম্বর-এ চার নেতাকে হত্যা করা হয়।
এই দিনকে জেল হত্যা দিবস বলা হয়।

① তাজউদ্দীন আহমেদ
② সৈয়দ নজরুল ইসলাম
③ এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান
④ এম. মনসুর আলী,

চার (4) নেতা।

17 এপ্রিল (মুজিব নগর দিবস)

① এই দিন "শপথ গ্রহণ" করা হয়েছিল। (17 April)
② স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
③

১৮ এপ্রিল

① প্রথম বেঙ্গল কাউন্সিল বিদেশী হিসাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১ আগস্ট (The Concert for Bangladesh)
(George Harrison)
Singer → (জর্জ হেরিসন)

① George Harrison-এর সাথে এই Concert-এ আর কে ছিল "পন্ডিত রবি শঙ্কর" (সেতার বাদক)।

② Concert-টি কোথায় হয়েছিল, "ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন।"

③

৬ ডিসেম্বর

① কে প্রথম স্বীকৃতি দেয়; ভারত।

যদি ৬ December-এ ভূটান মৌখিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, এর পর 7 December-এ স্বীকৃতি দেই।

৭ ডিসেম্বর

① কোন জেলা প্রথম স্বাধীন হয়; যশোর।

② এই দিনে USA- যুদ্ধ বিরতী দেয়।

③ USSR- ভেটো দেয়। (USSR- Union of soviet socialist Republics)

(৭) ভেটো অর্থ কি - (প্রতি একটি General Assembly).
USSR, USA, UK, China, France - এই পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন একটি রাষ্ট্র না বললে কোন কার্যক্রম পাশ হয় না তাকে ভেটো বলে,

১৪ ডিসেম্বর (শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস)

① শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত, রায়ের বাজার।

১৬ ডিসেম্বর - (বিজয় দিবস)

① বিকাল ৪.৩১ মিনিটে স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ৯১ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পন করেন।

② কে আত্মসমর্পন করে - জেনারেল নিয়াজি (পাকিস্তানের পক্ষে)
③ কার কাছে " " - জগজিৎ সিংহ অরোরা (ভারত)
④ বাংলাদেশের একজন উপস্থিত ছিলেন - এয়ার কমান্ডার এ.কে খন্দকার।
⑤ আত্মসমর্পন করে রেসকোর্স ময়দানে।
⑥ বাহিনীর নামটি ছিল, - মিত্র বাহিনী।

Scanned with CamScanner

বীরদের গল্প

বীরশ্রেষ্ঠ — ৭
বীর উত্তম — ৬৮
বীর বিক্রম — ১৭৫
বীর প্রতীক — ৪২৬

—— ৬৭৬

বীরশ্রেষ্ঠ	বাহিনী	বিশেষ তথ্য
(১) সিপাহী মোস্তফা কামাল	সেনাবাহিনী	মৃত (১৮ এপ্রিল ১৯৭১)
(২) ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রব	ই.পি.আর	
(৩) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	বিমানবাহিনী	সমাধি হয়েছিল করাচির মাসরুর বিমানবন্দরে, বর্তমানে মিরপুরে।
(৪) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ	ই.পি.আর	
(৫) সিপাহী হামিদুর রহমান	সেনাবাহিনী	
(৬) স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রুহুল আমীন	নৌবাহিনী	মৃতদেহ উদ্ধার হয়নি।
(৭) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	সেনাবাহিনী	সবার পরে মৃত্যুবরণ করেন (১৪ December)

Scanned with CamScanner

নারী বীর প্রতীক — ২

(১) তারামন বিবি

(২) সেতারা বেগম

সর্বকনিষ্ঠ (অল্প বয়সকো): শহীদুল ইসলাম- বীর প্রতীক (তার নাম লালু ছিল) ১২বছর ছিল

বিদেশী বীরপ্রতীক: WS ওয়ার ল্যান্ড (বাটা সু- কোম্পানী) [অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক নেদারল্যান্ড বংশদ্ভূত]

সেক্টর-১১

- সেক্টর-১ (চট্টগ্রাম) — জিয়াউর রহমান, পরবর্তী- মেজর রফিক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ,, -২- (ঢাকা) খালেদ মোশারফ, ,, - এটিএম হায়দার
- ,, — ৩ - শফিউল্লাহ
- ,, — ৪ -
- ,, — ৫ —
- ,, — ৬ —
- ,, — ৭ —
- ,, — ৮ — (মেহেরপুর)
- ,, — ৯ -
- ,, ১০ — কোন সেক্টরে কমান্ডার ছিল না।
- ,, ১১ —

Scanned with CamScanner

১-নং সেক্টর- চট্টগ্রাম

২-নং সেক্টর- ঢাকা

৮-নং সেক্টর- মুজিবনগর

১০-নং-সেক্টর- নৌবাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী বন্ধুরা

সাংবাদিক- সাইমন ড্রিং (simon Dring) - Britis.

September on Jessore road- Alleg Ginsberg (এলেন গিন্সবার্গ)

বীরপ্রতীক-

Concert for Bangladesh-

স্বীকৃতি

প্রথম- ভারত - 6 December

প্রথম আফ্রিকান- Senegal: Muslim

" ইউরোপীয়- পূর্ব জার্মানী

সর্বশেষ - China

যুক্তরাষ্ট্র - 4 April - 1972

পাকিস্তান - 22 February - 1974

Scanned with CamScanner

"স্মৃতিতে 1971"

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর — সেগুনবাগিচা-তে অবস্থিত

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-(স্থপতি কে)- সৈয়দ মঈনুল হোসেন

মুক্তির নগর ,, — (,,)- তানভির কবির

অপরাজেয় বাংলা- (,,) - সৈয়দ আব্দুল খালেক

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা-(,,) - শামীম সিকদার (তিনি একজন নারী)

সংশপ্তক — (,,) হামিদুজ্জামান খান

সাবাস বাংলাদেশ- (,,) নিতুন কুন্ডু

গান ও সাহিত্য

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে — সুরকার: আপেল মাহমুদ
গীতিকার: গোবিন্দ হালদার

একাত্তরের দিনগুলি — জাহানারা ইমাম।

একাত্তরের ডায়েরি- সুফিয়া কামাল।

একাত্তরের চিঠি- সংকলিত গ্রন্থ।

N:B- একাত্তরের প্রথম বই, রাইফেল, রোটি আওরাত।

Scanned with CamScanner

⌖ সব চেয়ে ছোট জেলা - নারায়ণগঞ্জ। ⌖ বড় জেলা – রাঙ্গামাটি

⌖ আয়তনে বড় থানা - শ্যামনগর। ⌖

⌖ ভারতের কয়টি রাজ্য বাংলাদেশের সাথে সীমানা আছে—
রাজ্য সংখ্যা – ৫টি; (i) পশ্চিমবঙ্গ (ii) আসাম (iii) ত্রিপুরা (iv) মিজোরাম (v) মেঘালয়

⌖ বাংলাদেশে → 111টি ছিটমহল
⌖ ভারতে → 51টি ,,

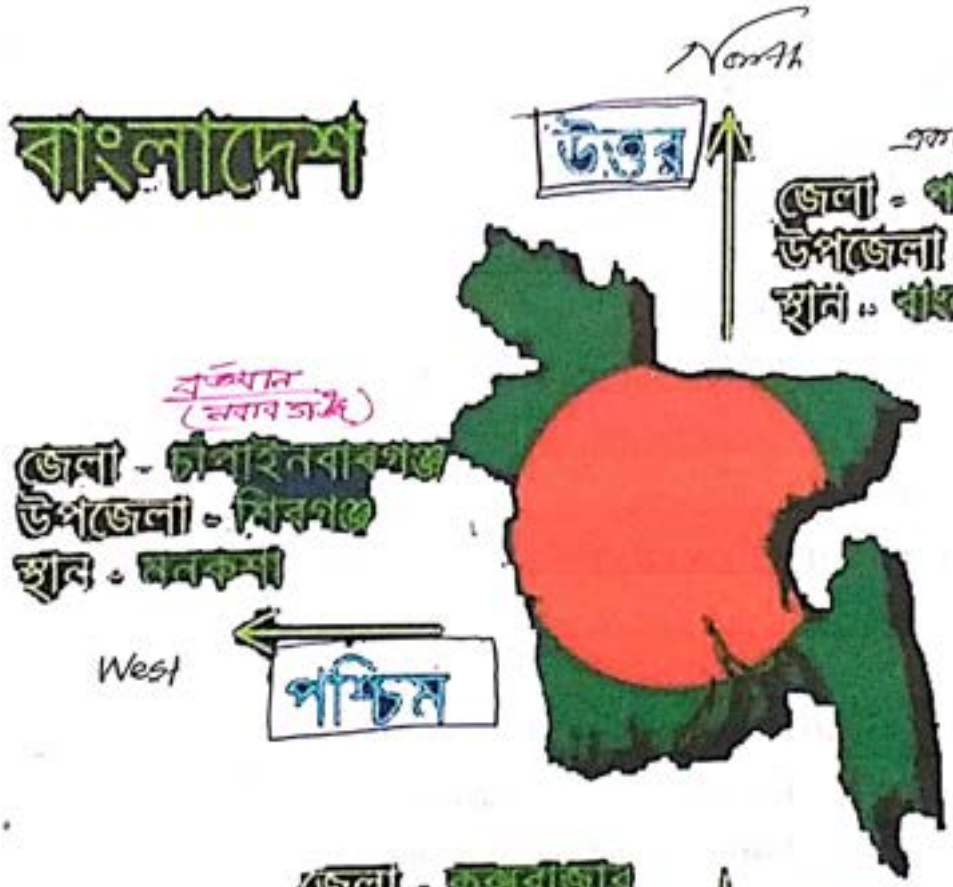

⌖ আয়তনে ছোট জেলা → বান্দরবান

⌖ ছিটমহলের ইংরেজি কি? – Enclave

Scanned with CamScanner